Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.: CSS 2006/ 10	Place of Publication: Katyayani Book Stall; No. 203, Cornwallis Street, Calcutta
Collection: Sharmadip Basu	Publisher: Girindrachandra Som
Title: *Joubaner Jadupuri*	Year of Publication: 12th ed. 1360 B.S. (1st ed. 1343 B.S.) **1953 (1st ed. 1936)**
	Size: 18.75 c.m. x 13 c.m.
Author: Nripendrakumar Basu (1898 – 1979)	Condition: Good.
	Remarks: Hard bound copy. Total pages: 116; Title page, content list are not included in numbered pages.

Microfilm roll No.: CSS	From gate:	To gate:

যৌবনের যাদুপুরী

শ্রীনৃপেন্দ্র কুমার বসু

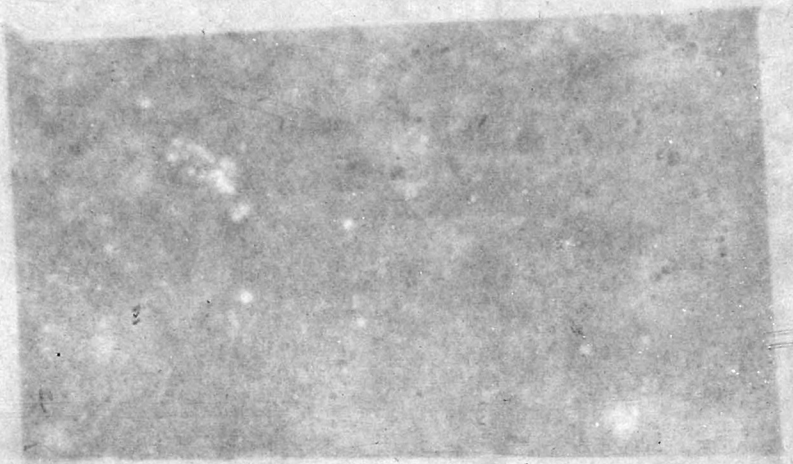

যৌবনের যাদুপুরী

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

প্রথম সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৪৩
দ্বাদশ মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৩৬০

কাত্যায়নী বুক ষ্টল
২০৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

দুই টাকা

প্রকাশক—শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র সোম
কাত্যায়নী বুক্ ষ্টল
২০৩, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিষয়=মালিকা

১।	যৌবন-দর্শন	এক
২।	যৌবনের কারণ-তত্ত্ব ও স্বরূপ	এগার
৩।	বিহার	আটাশ
৪।	আহার	তিপ্পান্ন
৫।	ব্যায়াম ও বিশ্রাম	চৌষট্টি
৬।	ঔষধাবলী	একাশী
৭।	যৌবনের অন্তঃপুরে	একশো দুই

প্রিণ্টার—পরমানন্দ সিংহ রায়
শ্রীকালী প্রেস
৬৭, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক কর্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ঃ সিংহদ্বারে ঃ বাঙালির যৌবন যেন শীতমণ্ডলে শীতকালীন্ সূর্য ; এই ওঠে, এই অস্ত যায়। তার যুবক-যুবতীর মুখে জৌলুস নেই, মনে স্ফূর্তি নেই, কল্পনার সঙ্গে কার্যের মিতালি নেই। ভোগের বাসনা হয়তো পুরাপুরি আছে, কিন্তু ভোগ কর্‌বার সামর্থ্য নেই, আদর্শানুরূপ উপাদান নেই, কার্য-সাধনের সুগম পন্থা জানা নেই।...যৌবন স্থির রাখ্‌বার জন্যে জগতের শত শত মনীষী চিন্তা ও চেষ্টার ত্রুটি করেন নি ; তাঁরা যৌবনের বন্যাজল বাঁধ্‌বার, রূপের তাজমহল অভঙ্গুর রাখ্‌বার কত না উপায় আবিষ্কার ক'রে গিয়েছেন। তারই মধ্যে যেগুলি অপেক্ষাকৃত সুলভ, সহজসাধ্য ও সুপরীক্ষিত, সেইগুলি এই ছোট্ট বইখানিতে তুলে দেওয়া হ'ল—বাঙ্‌লার যুব-সমাজের সাধনসৌকর্যের জন্যে।

প্রৌঢ়ত্বের মালভূমে উঠে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখ্‌চি, আমাদের জীবনের যত কিছু ব্যর্থতা, তা দুর্ভাগ্যের দোষে যত-না আসুক্—এসেচে আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে ; আর যা-কিছু অস্বাস্থ্য ও দৌর্বল্য—তার মূলে রয়েচে অবুঝ্ যৌবনের অতিরিক্ত প্রাণশক্তির প্রযোজনা, আহারে-বিহারে-নিদ্রায়-চিন্তায় বাঁধনহারা শৃঙ্খল-ছেঁড়া উন্মাদনা। কোন্ পথে চল্‌লে বাঙালির যৌবশক্তি তার আবেগ ও আসক্তিগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত কর্‌তে পারে, ভালবাসায় সুবিবেচনা—সম্ভোগে স্থৈর্য—সৌন্দর্য-রসবোধে সূক্ষ্মদৃষ্টি বিনিয়োগ কর্‌তে পারে, তারই একটি রেখাচিত্র এঁকেচি নিজের অনুভূতিলব্ধ ও অপরের বর্ণিত অভিজ্ঞতার রংতুলি দিয়ে।

এই বই পড়ে' যদি কারো কোন নূতন কোন প্রশ্ন করার বাসনা থাকে, তাহ'লে তিনি যেন দয়া ক'রে প্রশ্ন-পিছু **এক টাকা** এবং ডাকখরচ ৵০ পাঠান। দিবারাত্র ব্যস্ত থাকি আমি। বিশেষ প্রয়োজনে দেখা কর্‌তে গেলে **দক্ষিণা** দিতে হয়। চিঠির উত্তর আমি খুশিমত ও অবসর-মত দিই। বই প'ড়ে কেউ যদি কিছু উপকার পান, সেটা জানালেও আমার সব চেয়ে বড়ো আত্মপ্রসাদের কারণ হবে। ইতি। কলিকাতা ২০এ ভাদ্র, ১৩৪৩।

তৃতীয় সংস্করণে বক্তব্য

দশ মাসের মধ্যে একখানি বইএর তৃতীয় সংস্করণ বেরুনো নাকি একটা গৌরবের কথা। কিন্তু এর জন্য আমার প্রশ্রয়প্রদ পাঠকপাঠিকাদের সর্বাগ্রে ধন্যবাদ দিতে চাই।—২৬শে আষাঢ়, ১৩৪৪।

নবম সংস্করণে বক্তব্য

বাংলা সাহিত্যে জনকয়েক মাত্র সৌভাগ্যবান ও শক্তিশালী ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারের বই এবং চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত, গীতাদি ধর্মগ্রন্থ এ পর্যন্ত নবম বা তদধিক সংস্করণের মুখ দেখতে পেয়েছে। এতাবৎ অনাদৃত ও উপহসিত যৌনতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক তথ্য ও উপদেশভারাবনত এই বইখানির যে কখনো নবম সংস্করণ হবে—এ আমি আশা করতে পারিনি। এ সৌভাগ্য অবশ্যই আমার উপচীয়মান লোকপ্রিয়তার পরিচায়ক।

এ সংস্করণে বইখানির আমূল সংস্কার করেছি ও পাঠ্যবস্তু কিছু বাড়িয়েছি। প্রকাশের ব্যস্ততায় হয়তো দুই-একটি নিরীহ রকমের ভুল থেকে গিয়েছে। কিছুদিন পর্যন্ত আহার্য-পরিচ্ছদের দুর্মূল্যতার সঙ্গে সঙ্গে কাগজের দুর্ভিক্ষ এই সংস্করণ বার করা বিষয়ে আমাকে যেমনি হতাশ তেমনি নিশ্চেষ্ট ক'রে রেখেছিল। কিন্তু গ্রাহকগ্রাহিকাদের সনির্বন্ধ তাগিদ আমার চেয়ে প্রকাশককে চঞ্চল করেছিল বেশী; কারণ গ্রন্থস্বত্বের সুফল ও কুফল তিনিই ষোল আনা ভোগ করেন। এই কন্ট্রোল, কালাবাজার ও দুর্ভিক্ষের মর্মমেও তিনি পাঠককুলের জন্য কিছু আধ্যাত্মিক ঘি-ভাতের জোগাড় করেছেন। এখন কিছুদিনের জন্যে সকল পক্ষই নিশ্চিন্ত হলেন। ইতি--

৪৯, কর্নোআলিস্ স্ট্রীট্, কলিকাতা।
শুভ ১লা বৈশাখ, ১৩৫২

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

প্রথম প্রকোষ্ঠ—যৌবন-দর্শন

আধুনিক কালের এক বাঙালি কবি গাহিয়াছেন—

"নিখিলের ওষ্ঠপুটে ওষ্ঠ রাখি' করিছে যে পান,
হে কবি আজিকে তার—
তার তরে রচ শুধু গান;
রচ গান যৌবনের।"

* * *

কবি যৌবনের গান গাহেন, দার্শনিক যৌবনের রহস্য-গুহার অন্ধকারে রংমশাল জ্বালেন, বৈজ্ঞানিক যৌবনের ধর্ম ও স্বরূপ-বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেন। শিল্পে, সাহিত্যে, যুগযুগান্তের সভ্যতায় বিস্রস্ত যৌবনের চিরজয়োৎসব-লিপি। জীব-জীবন অনাদিকাল ধরিয়া স্বকৃচন্দনে তাহারই অভিনন্দনের ডালি সাজাইয়া বিনিদ্র উৎকণ্ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। নিখিল জগৎ যৌবনের প্রাণশক্তির মূলধন লইয়াই নিয়ত পরিণতির পথে চলিতেছে—মহাপ্রকৃতি তাহার সৃজন-বিনাশের কুলালচক্র অবিশ্রাম ঘুরাইতেছে।

জন্ম-মৃত্যুর মতোই যৌবন এক পরম সত্য। যৌবনই আমাদিগকে মৃত্যুর মহাসিন্ধু-মাঝে অমৃতের সিদ্ধমন্ত্র কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করাইয়া দেয়, ভঙ্গনের মাঝে গঠনের অনুপ্রাণনা দিয়া আমাদিগকে কর্মপ্রমত্ত করিয়া তুলে। যাদুকর যৌবন বিদ্রোহের মধ্যে শান্তি—বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য—সীমার মাঝে অসীমের সুর ধ্বনিয়া তুলে। অন্তরকে বাহিরের—বাহিরকে অন্তর্লোকের পথ দেখাইয়া দিতে, একাধারে ভোগ ও ত্যাগের উন্মাদনায় সকল ইন্দ্রিয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিতে, চিরবিস্মৃতির তন্দ্রাচ্ছন্নতা হইতে আত্মচেতনার এক সমারোহ-মুখর পুলকোজ্জ্বল লোকে সে আমাদিগকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়। যৌবনকে কাহারো উপায় নাই অস্বীকার করিবার—স্পর্ধা নাই অশ্রদ্ধা করিবার। নশ্বর জীবনের অবিনশ্বর সত্য—যৌবন!

ঋতুর মধ্যে বসন্ত যেমন, জীবনের মধ্যে যৌবন তেমনি। জড় ও জৈব প্রকৃতির মধ্যে সৌসাদৃশ্য এইখানে। শীতের শেষ নব মধুমাসের অগ্রদূত। দুর্বার যৌবনের মতোই ভুবনবিজয়ী চিরসুন্দর ঋতুরাজ শুষ্ককঠিন প্রান্তরের বুক ভাঙ্গিয়া, পলিতকেশ বনানী-শৈলের পঞ্জর থর্ থর্ কাঁপাইয়া, তাঁহার বিচিত্রবর্ণ পতাকাশোভিত নির্মম মনোরম মহারথে চড়িয়া জয়যাত্রায় চলেন। ভ্রমরপুঞ্জ কুঞ্জে কুঞ্জে তাঁহার বীরত্ব-গাথা গুঞ্জন করে, দক্ষিণা বায়ুর মর্মরধ্বনিতে—সরিতের কলনিস্বনে বিঘোষিত হয় তাঁহার আগমনী। নবশ্যাম পত্রপল্লবে তাঁহার বিজয়-তোরণ সজ্জিত, ফুল্ল কিংশুকের আরক্ত দলে তাঁহার চরমপত্র প্রেরিত। দাড়িম্ববনের অর্ধোস্ফুট সলজ্জ হাস্য, মাধবীর সুরভিরেণু, বকুলের অবিশ্রাম পুষ্পবর্ষণ, দোয়েলের চটুল লাস্য বসন্তের যাত্রাপথকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া দেয়। চীনাংশুক-পরিহিতা কৃষ্ণচূড়া তাহার হৃদয়-দেবতার পদে অর্ঘ-নিবেদনে নতশির, কাঁটালি-চাঁপার বুকের কুঁড়ি তাঁহার মদির নিঃশ্বাসের উষ্ণ পরশ পাইয়া উদ্ভিন্ন, হরিৎ চূতমুকুল

গোপন পদ্মাসনে তাঁহার গন্ধমাল্যের স্পর্শলাভে কৃতার্থমন্য! কোটি পিক-চন্দনা তাঁহার মুগ্ধ বৈতালিক, ঊষার অপূর্ব রক্তিম ছটায় উদ্ভাসিত তাঁহার মধু-মাঙ্গলিক!

এই-যে নবযৌবনের নববসন্তের উদ্দাম প্রাণবন্যা ফেনিল উচ্ছ্বাসে উচ্ছল চঞ্চল উন্মুখর হইয়া অজানার সন্ধানে দূর দিগন্তের দিকে আপনার গতিবেগে আপনি ধাবমানা, জগতের চিররহস্য-ভেদের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষায় কম্পমানা, ইহার পরিণতি কোথায়? ইহার প্রবৃত্তির উৎসমূল কই—নিবৃত্তির উপাদানই বা কি?…তাহার সমাপ্তি বুঝি আত্মবিসর্জনে, জরামৃত্যুর নিত্যমন্ত্রিত মহাসিন্ধুর বক্ষোমধ্যে!

কিন্তু এই মৃত্যু শীতের মতোই যৌবনের প্রস্তুতি-ক্ষেত্র,—তাহার মধ্য দিয়াই যৌবন বারে বারে মানুষের কাছে ফিরিয়া আসে। মুহূর্তের জন্য তাহাকে অভিভূত অব্যক্ত দেখি, সে যেন পটান্তরের বিরাম। ফিরিয়া পাইব বলিয়া আমরা তাহাকে হারাই এবং হারানোর ভিতর দিয়াই আবার তাহাকে পাই। তাই মানুষের সর্ব কর্ম, সর্ব জ্ঞান, সর্ব চিন্তা, সর্ব বৃত্তির মধ্যেই দেখি—অফুরন্ত যৌবনের বহুরূপী বিকাশ, নব নব লীলা-তরঙ্গ, অভিরাম নৃত্যচ্ছন্দ!

এই আনন্দ-লীলাকে যে সঙ্কোচ করে, ভয় করে, 'নেতির' চশমা পড়িয়া এড়াইয়া চলে, সে জীবনকে দেখে তিক্ততর—মৃত্যুকে দেখে নিকটতর। সে জীবন্ত হইয়াও জড়মাত্র, জগতের একান্ত করুণার পাত্র! কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কোন পত্রের একস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন, "জীবনটা অমর ব'লেই তাহাকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বারে বারে নবীন কোরে নিতে হয়। পৃথিবীতে জরাটা হচ্ছে পিছনের দিক্, ওর সামনের দিক্‌টা যৌবন। এইজন্য জগতে চারিদিকে যৌবনটাকেই দেখ্‌চি, আর জরাটা তার পিছনে স'রে যাচ্ছে। তাকে এই দেখ্‌চি তার পরক্ষণেই দেখছিনে। যেই শীতে সমস্ত

ঝ'রে পড়ল, অমনি দেখ্‌লুম—শীত নেই, বসন্ত এসে পূর্ণ কোরে বসেচে। তার থেকেই বুঝ্‌তে পারি আমাদের জরা যৌবনের বাহন।"

জন্ম-মৃত্যুর মিলনের পুরোহিত হইল যৌবন, চির-অমৃতলোকের স্বর্ণসেতু হইল সে। যৌবন আছে বলিয়াই মানুষ গতিশীল, বর্ধ নশীল, মৃত্যুঞ্জয়ী। যৌবন আছে বলিয়াই প্রেম আছে, প্রেম আছে বলিয়াই সৌন্দর্য-বোধ আছে—স্নেহ আছে—ভক্তি আছে, জীবসৃষ্টিধারা অব্যাহত আছে। সুতরাং যুগে যুগে কবিকুল যৌবনের গান গাহিয়া এবং শুনাইয়া কিছু অন্যায় করেন নাই; বরং নিজেদের ও অপরের আনন্দকে বহুগুণ বাড়াইয়াছেন—জরা-বার্ধক্যের অভিক্রমকে অল্পবিস্তর ব্যাহত করিয়াছেন, মানুষের পরমায়ুকেও বোধ হয় কিয়ৎ পরিমাণে বর্ধিত করিয়া দিয়াছেন। নমস্য তাঁহারা আমাদের।...

তবে এই যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের যুগে কবির গান শুনিয়াই শুধু মুগ্ধ হইলে চলিবে না; যৌবনের হোমশিখার তাপ শুধু কাব্যের মধ্য দিয়াই গ্রহণ করিলে হইবে না। তাহার আধ্যাত্মিক তথ্য শুধু ভাবুকের প্রাণ দিয়াই উপলব্ধি করিলে চলিবে না। যে সত্যকে কবি আপন আনন্দময় অনুভূতির মধ্য দিয়া শব্দ, ভাব, ছন্দ ও উপমার পুষ্পপত্রে সাজাইয়া প্রকাশ করেন, তাহা যতখানি সুন্দর—তদনুপাতে শিব না হইতেও পারে। তদুপরি ভাবমুগ্ধ কবির হাতে যেন তাহার স্বরূপ, বিশিষ্ট কার্যকারিতা ও প্রয়োগ-কৌশলের প্রণালীবদ্ধ রীতিগুলি পত্রপুষ্পের রসঘন সন্নিবেশ-তলে চাপা পড়িয়া যায়। বৈজ্ঞানিকও সত্য প্রকাশ করেন—প্রচার করেন বটে, কিন্তু তিনি ভাবাতিশয্যে আত্মহারা না হইয়া স্থিরমস্তিষ্কে চুল চিরিয়া তাহার বিশ্লেষণ ও বিচার করেন; তাহাকে সুন্দর যতখানি না করেন, তার চেয়ে বেশী করেন তাহাকে কল্যাণকর।

সুতরাং যৌবনের স্বপ্নে, যৌবনের মোহন আবেশে, যৌবনের সুরভিত স্মৃতিতে বিভোর না হইয়া, বৈজ্ঞানিকের

হাত ধরিয়া, আসুন, আমরা যৌবনের শ্রুতি, গতি ও প্রকৃতির একটু নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া দেখি। এমন একটা কার্যকরী জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা করি, যাহাতে যৌবনকে আপন আপন সীমাবদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি দিয়া আমরা মাপিতে পারি, তাহার উদ্দাম শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারি, তাহার সাধনাকে সার্থক সুন্দর সুফলপ্রসূ করিয়া জীবনকে সুষ্ঠ সুখাবহ করিয়া তুলিতে পারি।..... * ..... * ..... *

পৌরাণিক কাহিনী।...রাজা যযাতি বার্ধক্য সমুপস্থিত দেখিয়া যেমন ম্রিয়মান, তেমনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি পুত্রকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে পিতৃভক্ত পুত্র কে আছ, যে তাহার যৌবন আমাকে ধার দিতে পার? আমার ভোগসুখ-তৃষ্ণা এখনো মেটে নি, আমি আরো কিছুকালের জন্য যৌবনকে প্রত্যাগত দেখ্‌তে চাই।" সর্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু সানন্দে পিতাকে আপন যৌবন প্রদান করিলেন। ফলে যযাতি সহস্র বৎসর ধরিয়া যুবাজনোচিত ভোগরাগে নিজেকে নিমজ্জিত রাখিয়া, পরম তৃপ্তিভরে পরলোক-যাত্রা করিলেন। ...

হাস্যরসিক কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যঙ্গচ্ছলে তাঁহার এক গানে পুরাণকর্তারা 'ভাঙ্' খাইতেন বলিয়া একটা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কোনো-কোন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানী আপন কল্পলোকে পুরাণকারদিগকে গঞ্জিকা পর্যন্ত সেবন না করাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের এই সকল অসম্ভব কাহিনী ও উচ্ছ্বসিত অতিশয়োক্তির অগাধ লবণাম্বুরাশিতে ডুব দিয়া, অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিক আজকাল দুই-চারিটি সাঁচ্চা শুক্তি ও মূল্যবান প্রবাল তুলিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আসল কথা হইল যে, যযাতি উপভোগ-সামর্থ্যহীন হইয়াও হাল ছাড়িয়া দেন নাই, আপন লুপ্ত পুরুষত্ব ফিরিয়া

পাইবার বিধিমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। নির্লজ্জ সম্রাট্ শেষে বোধ হয় উপযুক্ত দাওয়াই সন্ধান করিবার জন্য বয়ঃপ্রাপ্ত তিনটি পুত্রকে সকাতর অনুরোধ করিয়াছিলেন। সম্ভবত তৃতীয় রাজকুমার পুরু সারা ভারতের শহর-পল্লী-পর্বত-কান্তার চুঁড়িয়া এমন একজন চিকিৎসক পাইয়াছিলেন—যিনি অথর্ব মহারাজের মরা গাঙে কিছুকালের জন্যও জোয়ারের জল প্রবেশ করাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় বলেন, রাজানুগ্রহভোগী পুরাণকারগণ কোন রাজকীয় ঘটনার স্থায়িত্ব বা ব্যাপকত্ব নির্দেশ করিতে গিয়া অলঙ্কার-হিসাবে প্রায়ই একবৎসর স্থলে শতবৎসর লিখিয়া বসিয়াছেন, অর্থাৎ দক্ষিণে অসঙ্কোচে দুইটি শূন্য বসাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই যুক্তিযুক্ত গবেষণা যদি মানিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে যযাতির ক্ষেত্রে দেখা যে, তিনি হাজার স্থলে দশ বৎসর মাত্র নূতন করিয়া যৌবন-সামর্থ্য ভোগ করিতে পারিয়াছিলেন।···

কুড়ি-বাইশ বৎসর পূর্বে ডাঃ ফরোনফ ও স্টাইনাক্ কর্তৃক প্রবর্তিত গ্ল্যাণ্ড্-গ্র্যাফটিং বা বানরের গ্রন্থিযোজনা-দ্বারা আশীপতিপর বৃদ্ধও দুই হইতে বড় জোর ছয় বৎসর কালের জন্য যৌবনের কিছু দার্ঢ্য ও কর্মশক্তি ফিরিয়া পাইত; যদিচ তাহাতে কাহারো পরমায়ু বৃদ্ধি পায় নাই—সন্তানোৎপাদন-শক্তিও ক্বচিৎ ফিরিয়া আসিয়াছে।···সর্বকালে সর্বদেশেই মানুষের মধ্যে যৌবনকে অটুট রাখিবার বা তাহাকে আংশিকভাবে ফিরিয়া পাইবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে—বিশেষভাবে ষড়ৈশ্বর্যভোগী অভিজাত ও বণিগ্‌দিগের মধ্যে। রাজা যযাতির গল্প বোধ তাহারই একটা রাংতামোড়া চটক্‌দার অভিব্যক্তি মাত্র।···

রাজা যযাতি তো পুরাণোক্ত ব্যক্তি। কিন্তু তাঁহার পূর্বে বৈদিক সাহিত্যের গর্ভ-গৃহে প্রবেশ করিলে দেখিবেন—

চ্যবন ঋষি সুদূর অতীতের প্রগাঢ় অন্ধকারে বৈদূর্যমণির মতো ঝক্‌ঝক্ করিতেছেন। তাহা হইলে গল্পটা দুই-চারি কথায় মধ্যে বলিয়া ফেলি, শুনুন!···

সেই সুবর্ণমণ্ডিত সত্যযুগের কোন এক সময়ে শর্যাত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি যেমন সোমরস প্রস্তুত করিতে পারিতেন, তেমনটি আর কেহ পারিত না। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র প্রায়ই তাঁহার স্বহস্ত-প্রস্তুত সোমরস পান করিতে প্রলুব্ধ হইয়া স্বর্ণরথে চড়িয়া তাঁহার প্রমোদগৃহে নামিয়া আসিতেন এবং শতমুখে উহার তারিফ্ করিতেন। এই শর্যাত রাজার এক লাবণ্যললামভূতা যুবতী-কন্যা ছিল, নাম তাহার সুকন্যা। তাহার মতো নাচিতে-গাহিতে পারে, এমন কন্যা তখনকার কালে কোন রাজার প্রাসাদান্তঃপুরে মিলিত না। রাজা এই অশেষ রূপগুণযুতা কন্যার ক্ষণিক অদর্শনে প্রলয়ান্ধকার দেখিতেন।

একদিন নৃপতি পাত্র-মিত্র-কন্যা সমভিব্যাহারে দূর গহন বনে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। বনের এক প্রান্তে একটু ফাঁকা জায়গায় রাজার শিবির পাতা। রাজা প্রভাতে মৃগয়া করিতে বনের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন। সুকন্যা যতটুকু সময় পারে শিবিরের বাহিরে ইতস্তত একাকিনী ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়ায়। একদিন বৈকালে সে বনের মধ্যে বেড়াইয়া, প্রদোষের প্রায়ান্ধকারে ত্রস্তপদে শিবিরে ফিরিতেছিল, এমন সময় দেখিল, একটা লতাগুল্মাচ্ছাদিত মাটির ঢিবির মধ্য হইতে দুইটি ছোট ঝিনুকের মতো জিনিস আধ-আঁধারে জল্‌জল্ করিতেছে! সুকন্যা কৌতূহলপরবশ হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল; পরক্ষণে একটা কাঠি দিয়া উজ্জ্বল বস্তু দুইটিকে মাটির মধ্য হইতে খোঁচাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে গেল! কিন্তু বিস্মিত আতঙ্কে চাহিয়া দেখে—কাঠি বিঁধাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বস্তুদ্বয় যেন নিষ্প্রভ হইয়া গেল এবং তৎস্থলে দুইটী বিশীর্ণ রক্তধারা উৎসারিত হইয়া উঠিল।

আসল ব্যাপারটা এই।…চ্যবন ঋষি ঐ জায়গায় বসিয়া বহুকাল পূর্বে তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ধ্যানমগ্ন ঋষির চারিপাশ দিয়া মাটির স্তূপ উঠিয়াছে; তাহাতে গাছপালা জন্মাইয়াছে; শুধু তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ঢিবির বাহিরে জাগিয়াছিল। সুকন্যার পদশব্দ পাইয়া চ্যবন ঋষি তাঁহার তপোদীপ্ত নয়নদুইটি উন্মীলন করিয়া তাহাকে নির্নিমেষভাবে দেখিতেছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুইটি কাঠি আসিয়া তাঁহার নয়নতারায় বিদ্ধ হইল, চক্ষের জ্যোতি তখনই নিবিয়া গেল। ব্যথাকাতর ঋষি মৃত্তিকা ভেদ করিয়া, অভিযোগের রুদ্র আভাস সর্ব অবয়বে মাখিয়া সুকন্যার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁহার শীর্ণ ধূসর শরযষ্টির মত দেহ, আভূমিলুণ্ঠিত শ্বেত শ্মশ্রু, শিরে শুষ্কপিঙ্গল জটাজাল, শোণিতপ্লাবিত অন্ধ নেত্রযুগল দেখিয়া যুবতী মরমে মরিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।…সেই দণ্ডেই বনস্পতিকুলের পল্লবিত পত্রচ্ছায়ার ঘন চন্দ্রাতপ-তলে অনুতপ্তা সুকন্যা বনমালা দিয়া দৃষ্টিহীন বৃদ্ধ ঋষিকে পতিত্বে বরণ করিল।

রাজা শর্যাত কন্যার দুর্মতির কথা শুনিয়া একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাহাকে অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া রাজধানীতে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু সে স্বীকৃত হইল না;—সেই বিপদসঙ্কুল অরণ্যে সহায়-সম্পদহীন জরাগ্রস্ত অন্ধ স্বামীর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া একাকিনী পড়িয়া রহিল।…

কিন্তু চ্যবনের মনে কি সুখ আছে? তিনি পত্নীর সহায়তায় সেখানে একটি কুঁড়েঘর বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর যতকিছু ভোগরাগের ছবি সহস্র বর্তিকা জ্বালাইয়া তাঁহার বাসনাবিহ্বল হৃদয়-প্রান্তে আসিয়া হানা দেয়; চম্পক-রজনীগন্ধা-বনযূথীর ঝাড় গন্ধের পশরা দিয়া তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলে, প্রভাতের সোনালী আলো—চন্দ্রমার রূপালী জ্যোৎস্না আসিয়া তাঁহার প্রাণে আবেশ-ভরা-পরশ বুলায়। পার্শ্বে তাঁহার রূপযৌবনশালিনী নিধুবন-বঞ্চিতা

ভার্যা,—উচ্চতটশালী উরসে তাঁহার যৌবনের ক্ষুধিত জলোচ্ছ্বাস ক্ষুব্ধ আক্রোশে আছাড় খাইয়া মরিতেছে। কিন্তু তিনি একান্ত অপারগ! আত্মগ্লানিতে যোগবিরত সন্ন্যাসীর ভোগলোলুপ মন তীব্র তিক্ততায় ভরিয়া উঠে।

সুকন্যা দিবারাত্র স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উদ্দেশে সকাতরে আপনার ও স্বামীর মনোবেদনা জ্ঞাপন করে, তাঁহাদের বর প্রার্থনা করে। অক্ষুণ্ণযৌবন অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেখা দিলেন বটে,কিন্তু সুকন্যার মন-পরীক্ষার ছলে তাহাকে প্রথমত নানা প্রলোভন দেখাইলেন। কিন্তু সুকন্যা তাহাতে ভুলিবার মেয়ে নহে,—সে ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লয়, আনতচক্ষে নীরবে অশ্রু-মালিকা বুনিতে থাকে। অবশেষে অশ্বিনীকুমারদ্বয় তুষ্ট হইয়া চ্যবনকে দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিলেন, এবং ঔষধ দিয়া তাঁহার শরীরে যুবার বল ও যৌবনের কান্তি অর্পণ করিলেন। নবীন যৌবনের বন্যাস্রোতে ভাসিয়া চ্যবন অপার আনন্দে সুকন্যাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। আবার তাঁহার মৃত মালঞ্চে সহস্র সুরভিকুসুমের মোহন মেলা বসিল, আবার কুঞ্জবনে ধ্বনিয়া উঠিল কোকিলের অমিয়মাখা কুহুস্বর।… এই মধুর মিলনের ফলেই হয় নাকি মহর্ষি বাল্মীকির জন্ম!

গল্পটির মধ্যে হইতে আমরা নিঃসংশয়ে এই তথ্যটুকু ছাঁকিয়া তুলিতে পারি যে, তখনকার দিনে বনচারী বৃদ্ধ যতীরাও রূপসী রাজকন্যাদের প্রেমে পড়িতেন এবং সে প্রেমের প্রতিদানও বহুক্ষেত্রে পাইতেন। কিন্তু অনেকেই তাঁহাদের রূপসুধা উপভোগের অসামর্থ্যে গুমরিয়া মরিতেন। উভয় পক্ষেরই ত্রাণ ও তৃপ্তির নিমিত্ত তখন রাজকন্যারা দেশের শ্রেষ্ঠ বৈদ্যদের শরণ লইতেন।…

কবিরাজ মহাশয়গণ দাবি করেন যে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় যে ঔষধ খাওয়াইয়া ঋষি চ্যবনকে বিগতজর ও যৌবনশ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহার নামই চ্যবনপ্রাশ। আধুনিক কালে সুপ্রস্তুত চ্যবনপ্রাশের যৌবন-প্রত্যর্পণের ক্ষমতা কতটুকু

আছে বলিতে পারি না।...স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় সোমরসাচ্ছন্ন ঋষিমস্তিষ্কের একেবারে নিরবয়ব সৃষ্টি নহে,—আলোচ্য গল্পের মধ্যে তাঁহাদিগকে তাৎকালীন্ দেশের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসককুলের সাধারণ প্রতীক বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। বেদে পাওয়া যায়, কাল ও বন্দন নামক আর দুইজন জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকেও অশ্বিনীকুমারদ্বয় ঐভাবে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।...

মধ্যযুগে পারস্য হইতে টিউনিস্, স্পেন হইতে হিন্দুস্থান পর্যন্ত দেশসমূহের মুসলমান রাজাদের মধ্যে যৌবনকে অটুট রাখিবার ও বিশেষভাব নারীসম্ভোগশক্তি বর্ধিত করিবার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলীর সহায়তা লইয়া গবেষণা, অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-প্রয়োগ করিবার একটা অদম্য উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। দ্বাদশ হইতে ষোড়শ শতক পর্যন্ত চারি শতাব্দীর মধ্যে আরব ও পারস্যদেশে অন্তত আঠারোখানি যৌবন-সংরক্ষণ বিষয়ক প্রামাণ্য পুঁথি প্রণীত হইয়াছিল। রসায়ন ও বৃষ্য বা বাজীকরণের ঔষধ লইয়া হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্র সেই অথর্ব বেদের সময় হইতে বহু গবেষণা ও নির্দিধ্যাসন করিয়াছেন এবং বহু ফলপ্রদ ভেষজেরও সন্ধান দিয়াছেন। অধুনাতন পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান এখনো এবিষয়ে বহুমুখী গবেষণা করিতেছে এবং নানাদিক্ দিয়া জরাকে প্রতিহত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, কোনকালে কোন দেশের মনীষিমণ্ডলী এ বিষয় পূর্ণকৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

ইহা প্রমাণসিদ্ধ সত্য যে; এখনও জগতে এমন একটি ঔষধ বা মন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই যাহা আমাদের যৌবন অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ; এরূপ ঔষধ কখনো আবিষ্কৃত হইবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু যৌবনকে দীর্ঘকাল অটুট এবং বার্ধক্যেও যৌবনের প্রাণশক্তিকে কতকটা পরিমাণে অব্যাহত রাখিবার জন্য আবহমানকাল পণ্ডিতগণ নানারূপ ঔষধ, নানারূপ শারীরচর্যা ও মানসিক ব্যায়ামচর্চার বিধান দিয়া আসিয়াছেন।...সেইগুলি বিবৃত ও বিচার করিবার নিমিত্তই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্ভব।

দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ——যৌবনের কারণতত্ত্ব ও স্বরূপ

একটি ক্ষুদ্র বীজ অনুকূল ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া যেমন এক বিরাট মহীরুহের সৃষ্টি করে, জীবজগতেও তেমনি ঐ একই ক্রিয়া। একটি মাত্র কোষাণু (cell) হইতে একটা ক্ষুদ্র কড়িং বা অতিকায় গরিলার অভিব্যক্তি হয়।...এখন দেখা যাক্ কোষাণু জিনিসটি কি?

মাতৃদেহের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি অণ্ডাণুর (Ovum) সহিত পুরুষদেহের ততোধিক ক্ষুদ্র একটি শুক্রকীটাণু (Spermatozoon) নিজেকে সংযুক্ত করিলেই জীবাঙ্কুরের সৃষ্টি হয়। ঐ জীবাঙ্কুরটি জরায়ু-মধ্যস্থিত মাংসল প্রাচীর-গাত্রে প্রোথিত হইয়া, অনুকূল আবহাওয়ায় বর্ধনোপযোগী হয়। এই জীবাঙ্কুরকে এক কোষাণু সমন্বিত একটি প্রাণী বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে। উহা যখন উপযুক্ত রস-সাহচর্যে বৃদ্ধি পাইতে, স্বতই একটা বিশিষ্ট আকার ধারণ করিতে এবং আপন দেহ হইতে আর একটি নূতন দেহের সৃষ্টি করিতে পারে, তখন উহাকে ক্ষুদ্রতম প্রাণী ছাড়া আর কি বলিব? এই একটি সূক্ষ্ম কোষাণু হইতে শত-সহস্র-অযুত-লক্ষ-কোটি-অর্বুদ কোষাণু জন্মিয়া ও পরস্পর ঘন-সন্নিবিষ্ট হইয়া আপনা-আপনি জায়মান ভ্রূণের এক-একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃজন করে,—যেমন শতদলের এক-একটি করিয়া দল বিকশিত ও বর্ধিত হইয়া তাহার পূর্ণবিকাশ সাধন করে।

আমাদের শরীরের ভিতরকার প্রত্যেক যন্ত্র—মায় মস্তিষ্ক, বাহিরের সমস্ত ইন্দ্রিয়স্থানগুলি—মায় চর্ম, সমস্তই বিভিন্ন আকৃতির কোষাণুসমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। চক্ষুর অগোচর এক-একটি কোষাণুর মধ্যে থাকে অতিসূক্ষ্ম পরিমাণ

একপ্রকার আঠাল পদার্থ, নাম তাহার 'মৌলধাতু' (Protoplasm)। উহার মধ্যভাগে ঠিক উদ্ভিদ-বীজের মতোই থাকে একটি 'প্রাণবিন্দু' (Nucleus)। মৌলধাতু হইল কোষাণুর খাদ্যগ্রহণ ও শক্তিজননের আধার—ইহারই পুষ্টির উপর নির্ভর করে সমগ্র জীবদেহের স্ফূর্তি। একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া এক-একটি কোষাণু তাহার প্রাণবিন্দু সমেত দেহ লইয়া ধীরে ধীরে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়। ক্রমশ দুইটি হইতে চারিটি চারিটি, হইতে আটটি—এমনি করিয়া নিত্য শত-সহস্র নূতন কোষাণুর জন্ম হয়। ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি অর্থ—জীবদেহের ক্রমবিকাশ।

মানুষ—তথা প্রত্যেক জীবের দেহ একটি প্রকাণ্ড রাজ্য, তাহার প্রজাপুঞ্জ হইল মধুচক্রের মতো ওই সংখ্যাতীত কোষাণুকুল। 'রাজার জন্য রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায়'—এই প্রবচন দেহ সম্বন্ধেও চমৎকার প্রযোজ্য। দেহাধীশ্বরের যাহা কিছু গর্ব, যাহা কিছু সুখৈশ্বর্য, যাহা কিছু গতিস্থিতি—তাহা এই কোটী কোটী কোষাণুদিগের কল্যাণেই। এমন কি, যে খাদ্যটুকু আমরা খাই, তাহা পাকস্থলীতে পরিপাক পাইয়া ও রক্তস্রোতে মিশিয়া, তাহার সূক্ষ্মীকৃত কণাসমূহ দেহের প্রত্যেক কোষাণুর মৌলধাতুতে গিয়া আশোষিত হয়। আমরা শ্বাসক্রিয়া দ্বারা বায়ুমধ্যস্থ অক্ষজন (oxygen) বাষ্প ফুসফুসের মধ্যে টানিয়া লই; ফুসফুসের অসংখ্য বায়ুকোষ-সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জালবৎ ধমনীগুচ্ছ ঐ উপকারী বাষ্প শুষিয়া লইয়া, সারা দেহের কোষাণুপুঞ্জকে অবিরত বিলাইয়া দিতেছে। 'খাদ্য-জল-বাতাস ব্যতীত আমরা বাঁচি না'—এ কথার অর্থই হইল—আমাদের দেহের অসংখ্য কোষাণুনিচয় বাঁচে না। তাহাদের সংখ্যাতীত ক্ষুদ্রখণ্ড জীবনের সমষ্টি দিয়াই আমাদের এক-একটি বৃহৎ পরিপূর্ণ দেহসর্বস্ব জীবন-পরিবার; তাহাদের উত্থান-পতনের সহিত আমাদের প্রত্যেকের উত্থান-পতন একসূত্রে বাঁধা।

অস্থি বলুন, মাংস বলুন, মজ্জা বলুন, হৃৎপিণ্ড বলুন, যকৃৎ বলুন, এমন কি মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত যাহা কিছু দিয়া আমাদের দেহ-সৌধ নির্মিত, তাহার ইট-চুন-বালি-সিমেন্ট স্বরূপ হইল কোষাণুসমূহ। নবজাত শিশু হইতে বালক, বালক হইতে কিশোর, কিশোর হইতে যুবক—এই যে ধাপে ধাপে মানুষের ক্রমাভিব্যক্তি, ইহা যে মূলত কোষাণুদের সংখ্যা ও গুণের পরিবৃদ্ধির ফল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রতি মুহূর্তেই আমাদের কোষাণুপুঞ্জের কিছু-না-কিছু ক্ষয় হইতেছে এবং প্রতিমুহূর্তেই অন্তঃপ্রকৃতি নূতন কোষাণুপুঞ্জের দ্বারা তাহাদিগের স্থান পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ছোট-বড় প্রত্যেক কর্মপ্রচেষ্টার ফলে তো বটেই, এমন কি শয়ন বা নিদ্রাকালেও কোষাণুদের অল্পবিস্তর ধ্বংসসাধন ও মৃত্যু-দাহন হইয়া থাকে।

কিন্তু এখানে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। মানুষ জরামরণশীল বটে, কিন্তু কোষাণুরা একপক্ষে অমর। কারণ, কোন কোষাণু একটা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার পর যখন দেখে তাহার মৃত্যু আসন্ন, তখন সে নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুইটি আনকোরা নূতন শিশুকোষাণুর সৃষ্টি করে। এমনি করিয়া নিজেকে সে হারাইয়াও হারায় না। এইভাবে পুরাতনের জীর্ণ কঙ্কালস্তূপ হইতে হয় নিত্যনূতনের আবির্ভাব, ম্রিয়মাণ শীতের বুক চিরিয়া হয় মধুমাসের প্রস্ফুরণ, ক্ষুদ্র জড়তার চিতাভস্ম হইতে হয় কর্মোদ্দীপ্ত যৌবনের নবজন্ম!

মানুষ যখন গর্ভে আসে, তখন সে শুধু পিতামাতার স্বাস্থ্য ও স্বভাবের খানিকটাকেই আগামী জীবনসত্তার মূলধন করিয়া লয় না, তাহার উভয়কুলের বিগত পূর্বপুরুষদের ধারার একটা অস্ফুট ছাপ ও নিকটগত কাহারো কাহারো স্বভাব-আকৃতিপ্রকৃতি বা সংস্কারের বীজকে এক বিশিষ্ট জৈবপ্রক্রিয়ার বলে আপনার ভ্রূণদেহে পরিশোষণ করিয়া লয়।

সেইজন্য আমরা দেখি, পিতামাতার অবয়ব-আকৃতি-প্রকৃতি-গাত্ররর্ণ, বিশিষ্ট রোগ বা চারিত্রিক প্রবণতা কোন কোন সন্তানে অনুপস্থিত ; অথচ পিতৃ ও মাতৃকুলের উর্ধ্বতন দ্বিতীয়, তৃতীয় বা পঞ্চম পুরুষ অনুসন্ধান করিলেই হয়তো সন্তানের রূপগুণ-গঠনবৈশিষ্ট্যের উৎসমূল খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।

সাধারণত কোন পরিবারের পিতৃপুরুষগণ যদি দীর্ঘজীবী হইয়া থাকেন, তাহা-হইলে শতকরা আশীটি ক্ষেত্রে পরবর্তী সন্ততিগণ দীর্ঘজীবী হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে। কিন্তু শুধু মাতৃকুলের পূর্বপুরুষগণ যদি দীর্ঘজীবী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শতকরা মাত্র বার-তেরটি ক্ষেত্রে বংশধরগণ সুদীর্ঘ পরমায়ু-লাভের আশা করিতে পারে। আবার, আজীবন স্বাস্থ্যবান বা যুবাজনোচিত ইন্দ্রিয়শক্তিসম্পন্ন বংশধারার (—উভয় কুল হইলে তো কথাই নাই,) সন্তানসন্ততিগণ প্রায়ক্ষেত্রেই 'বাপকো বেটা' না হইয়া ছাড়ে না। পিতার অর্শ, বাত, বহুমূত্র, যক্ষ্মা, সিফিলিস্ বা উপদংশ-বিষ, কুষ্ঠ, শ্বেতি, অকালবার্ধক্য, টাক্, কুরণ্ড, হার্নিয়া প্রভৃতি রোগ সন্তানে সঞ্চারিত হইতে দেখা যায়। অথবা ঐ রোগগুলিতে আক্রান্ত হইবার নিকট-সম্ভাবনীয়তা লইয়া সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কখনো কখনো কোন দম্পতির দোষগুণ এক পুরুষ ডিঙাইয়া পরবর্তী সন্তানে অনুস্যূত হইতে দেখা যায়।

দেখা গিয়াছে, অটুট স্বাস্থ্য, প্রলম্বিত যৌবন, অখণ্ড পরমায়ু-ব্যাপারে আমাদের বংশানুক্রমিক দায়ভাগ একটা মস্ত বড় নিয়ন্তা। তারপর, জন্মের পর পরিবেশ বা আবেষ্টনীর উপর বাকিটুকুর প্রায় সব ভারই ন্যস্ত। প্রথমত, শৈশবে ও বাল্যে মাতাপিতার প্রতিপালনের উপর পরবর্তীকালের স্বাস্থ্য অনেকখানি নির্ভর করে। দ্বিতীয়ত, কৈশোরকালে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন, পুষ্টিকর আহার্য, সর্বকার্যে নিয়মনিষ্ঠা, উপযুক্ত অঙ্গচালনা ও বিশ্রাম, সংসর্গ-নির্বাচন, আবেগ, সংসক্তি

ও প্রবণতা-নিয়ন্ত্রণের উপর ভবিষ্যৎ যৌবনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কল্পনার আকাশে প্রাসাদ নির্মাণ চলিতে পারে, কিন্তু বাস্তব জগতে বালুকায় উত্তুঙ্গ মীনার গঠন চলিতে পারে না। সুতরাং যৌবনকে দীর্ঘস্থায়ী ও দৃঢ়মূল করিতে হইলে, মাতৃগর্ভ ও শৈশব হইতে তাহার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়।

যাক্, এখন যৌবন কিভাবে ও কেমন করিয়া আসে, তাহার সম্বন্ধে যৎসামান্য বলিব। আমাদের দেশে মেয়েদের গড়্ পড়তা ষোল বৎসর হইতে এবং পুরুষদের আঠারো বৎসর হইতে যৌবনের সূত্রপাত। ইহার আগের ধাপ টিকে বলে কৈশোর। কৈশোর যৌবনের অগ্রদূত,—বার্ষিক ঋতুচক্রে মাঘের শেষাশেষি সময় আর কি! তখন হইতেই শিরীষ-বকুলের শুষ্কপত্র অল্পে অল্পে ঝরিতে থাকে. কুঞ্জকাননের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মলয়ানিলের আগমন-বাণী কানাকানি হইতে থাকে, দোয়েল-পাপিয়া লাজনম্র চূতমঞ্জরীর কাছে আসিয়া একটু-আধটু শীষ দিতে শুরু করে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কৈশোর ও যৌবন অপেক্ষাকৃত ক্ষণস্থায়ী ; আসে একটু শীঘ্র, যায় বড় তাড়াতাড়ি। তারপর, দীর্ঘ-পরাধীনতা-মুক্ত এই দরিদ্র দেশে সমাজ, রাষ্ট্র, ও পরিবারগত এমন সব প্রতিবন্ধকতা ছিল ও আছে, যাহাতে যৌবন না পারে যথোচিত স্ফূর্তি লাভ করিতে—না পারে আশানুরূপ উপভোগে আত্মনিয়োগ করিতে।

মোটামুটি আমাদের দেশের নারীর যৌবন পরিপূর্ণ বিকশিত হয়—উনিশ বৎসর বয়সের মধ্যে ; উহা স্থায়ী হয় বড় জোর ত্রিশ বত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত। ক্বচিৎ কোন সৌভাগ্যবতী হয়তো ছত্রিশ পর্যন্ত আপন যৌবনকে টানিয়া-টুনিয়া ধরিয়া রাখিতে পারেন। আজকাল বাঙালী মেয়েদের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় ও লোভনীয় যৌবন-লক্ষণগুলি (যথা—স্তন, নিতম্বস্থৌল্যাদি) বহুক্ষেত্রে ভাল করিয়া পরিস্ফুট হয় না, নচেৎ পরিস্ফুট হইয়া দুই-তিন চারি বৎসরের মধ্যেই শ্লথ, লোল ও বিশীর্ণ হইয়া যায়।

অধিক বয়স পর্যন্ত পুরুষসঙ্গ-বিরহিত অবস্থায় কালযাপন ও অল্পবয়স হইতে পুনঃপুন গর্ভধারণ—ইহার দুইটি মুখ্য কারণ বটে। কিন্তু কুলগত ও দেহগত কতকগুলি অনুপেক্ষণীয় গৌণ কারণও বর্তমান। পুরুষের যৌবন পরিণতাবস্থায় উপস্থিত হয় পঁচিশের মধ্যে; আর উহার স্থায়িত্বকাল মোটামুটি পঁয়ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত। কোন কোন ভাগ্যবান বাঙালি বড় জোর বিয়াল্লিশ পর্যন্ত নিজেকে যুবক বলিয়া চালাইবার স্পর্ধা রাখেন। তারপরই নিশ্চিত আসে প্রৌঢ়াবস্থা।

দেহ ও মস্তিষ্কের কতকগুলি বিভাগের পরিপুষ্টি ও শক্তিবৃদ্ধি যৌবনের মাঝামাঝি পর্যন্ত পূর্ণোদ্যমে চলে; তারপর উহার গতি স্তিমিত হইয়া পড়ে। যৌবনের শেষ পর্যন্ত প্রতিনিয়ত যাহা কিছু ক্ষয় পায়, তাহার ত্বরিৎ পূরণ সম্ভব হয়; কোষাণুদের জীবনিশক্তি ও আত্মবিস্তার-প্রচেষ্টা রীতিমত বলবৎ থাকে। প্রৌঢ় অবস্থায় ক্ষয় ও সঞ্চয়ের মাত্রা প্রায় সমান সমান থাকে। বার্ধক্যে ক্ষয়ের মাত্রা ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। দেহ-বিধান আর তেমন আগ্রহ ও উদারতার সহিত কোষাণুকুলকে জল-বায়ু-খাদ্য যোগাইতে পারে না। কাজেই তাহারা আপনাদিগকে উপবাসজনিত দুর্বলতার হাত হইতে তেমনভাবে আর বাঁচাইতে পারে না। রক্তস্রোত আসে ক্রমশঃ তরল মন্থর হইয়া, ব্যাধিবিষ আসে প্রলয়ের কলরোল কণ্ঠে লইয়া, সমস্ত দেহযন্ত্রের কল-কব্জা-স্ক্রু সমূহ যায় আল্গা হইয়া। অবশেষে যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড, বৃক্কদ্বয় (Kidneys), মস্তিষ্ক প্রভৃতি আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহের কোষাণুপুঞ্জ ক্ষয়িষ্ণু, অবসন্ন, উদ্যক্ত হইয়া একদিন উপবেশন-ধর্মঘট করিয়া বসে। তাহারই নাম মৃত্যু।···

আর মৃত্যুর কথা নয় যৌবনের কথায় ফিরিয়া আসি। যৌবন—জীবনের ক্রমপরিণতি-সোপানাবলীর একটি প্রশস্ত

ও রমণীয় ধাপ্ বিশেষ। কিন্তু এই বয়ঃক্রম আনে কে ও মানবের দেহ-মনে উহার বিশেষ প্রভাবলক্ষণগুলি ফুটায় কে? —অবশ্যই আমাদের দেহমধ্যস্থ কতকগুলি যন্ত্র। সাধারণ পর্যায়ে এই যন্ত্রগুলির নাম 'নির্নালী গ্রন্থিমালা' বা 'অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিমালা'। ইংরাজী বৈদ্যক গ্রন্থে ইহাদিগকে বলা হয়—'ডাক্টলেস্ গ্ল্যাণ্ডস্' বা 'এণ্ডোক্রাইন্স' (Endocrines)। আমাদের মনুষ্যত্ব, আমাদের ব্যক্তিত্ব, আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কায়মনোবাচিক্ ক্রিয়াসমূহ, ভৌতিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মূলে রহিয়াছে ঐ নির্নালী গ্রন্থিনিচয়। নানা আকারবিশিষ্ট এই রসস্রাবী গ্রন্থি বা ক্ষুদ্র থলিগুলি 'ঠুঁটো জগন্নাথ' বিশেষ; অর্থাৎ ইহাদিগের ভিতর যে বিশিষ্ট রসসমূহ প্রস্তুত হয়, তাহা ইহাদের গাত্রসংলগ্ন কোন নল দ্বারা বাহির হইয়া আসে না বলিয়া ইহাদিগকে নির্নালী বলা হয়। ইহাদিগকে অন্তঃস্রাবী বলা হয় এই কারণে যে, ইহাদের রস স্থানীয়ভাবে কোন উপকারসাধনের পর আবর্জনারূপে শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায় না; উহারা চুঁয়াইয়া চুঁয়াইয়া সমগ্র শারীর-বিধানের রক্তস্রোতের মধ্যে আপনা-আপনি মিশিয়া গিয়া, নানাভাবে উহাকে প্রভাবান্বিত করে।

চামড়ার নীচে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর্মস্রাবী-গ্রন্থি আছে, লোমকূপের মধ্য দিয়া উহারা অবিরত শরীরের আবর্জনা-মিশ্রিত ঈষৎ লবণাক্ত জল নিঃসারণ করিয়া দিতেছে। মুখাভ্যন্তরে ও জিহ্বার আশে-পাশে তিন জোড়া লালানিঃস্রাবী গ্রন্থি আছে; ইহাদের মধ্যকার রস তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালী দিয়া মুখের মধ্যে অবিরত নিঃসৃত হইতেছে। যকৃতের গায়ে একটি ক্ষুদ্র চামড়ার থলি আছে, ঐ থলির মধ্যে পিত্তরস জন্মে। এই তিক্তকটু নীলপীতাভ গাঢ়রস একটি নলিকার সাহায্যে ক্ষুদ্রান্ত্রের গোড়াকার বক্র অংশটুকুর মধ্যে ক্ষরিত হইয়া, খাদ্যমণ্ডস্থ ঘৃত, মাখন, তৈল প্রভৃতি স্নেহ জাতীয় পদার্থগুলি

পরিপাক করে ও মলরাশি কোমল, নিঃসরণযোগ্য করিয়া ফেলিতে সাহায্য করে। এইগুলি বহিঃস্রাবী বা সনালী গ্রন্থির দৃষ্টান্ত।

শ্বাসনালীর উর্ধ্বাংশে আছে বৈঁচিফলের ন্যায় রক্তাভ পিঙ্গলবর্ণের ছুইটি নির্নালী গ্রন্থি। উহাদের নাম **অবটুগ্রন্থি** (ইংরাজীতে বলা হয় 'থাইরএড্ গ্ল্যাণ্ডস্')। একটি ছোট পাৎলা অস্থিফলকের আচ্ছাদন দিয়া ওই প্রয়োজনীয় গ্রন্থিযুগল সুরক্ষিত। গলার বাহিরে এই অস্থিখণ্ডটি একটু প্রবর্ধিত; ঢোক গেলার সময় উহাকে একটু উঠানামা করিতে দেখা যায়। অবটুগ্রন্থির ভিতরে যে রস তৈয়ার হইয়া রক্তস্রোতের মধ্যে মিশিয়া যাইতেছে, তাহা আমাদের জীবন-ধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। ঐ রস আমাদের শরীরে কর্মোদ্দীপনা ও ওজস্বিতা উৎপাদন করে। উহা খাদ্য-পরিপাক, তাপজনন ও কোষাণুসমূহের বংশবিস্তার-ক্রিয়া বাড়াইয়া দেয়; ভ্রূ, নেত্রপক্ষ্ম, কেশোদ্গম, নখর, দন্ত, চর্ম প্রভৃতির উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া, একটি নির্দিষ্ট কাল বা বয়স পর্যন্ত শরীরে বৃদ্ধি, লালিত্য ও সৌন্দর্য-বিধানে অবটুগ্রন্থি-নিঃসৃত রসের সহায়তা বড় কম নহে।

এই রসের পরিমাণ কোন মানুষের রক্তের মধ্যে একটু অস্বাভাবিকভাবে কম বা বেশী হইলে, তাহার কেশ অত্যন্ত বিরল, মোটা ও রুক্ষ হয়; চর্ম অত্যন্ত পুরু ও খস্‌খসে হয়; দেহযষ্টি খর্ব ও বেমানান চর্বিবহুল হয়। অন্যদিকে তেমনি দেহের বাড় অত্যন্ত কম, বুদ্ধি অত্যন্ত স্থূল, স্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধতা, হৃদ্দৌর্বল্য, শরীরের যেখানে-সেখানে কেশ-প্রাচুর্য (এমন কি মেয়েদের ঈষৎ গোঁফের রেখা পর্যন্ত) ও যৌনস্পৃহা রীতিমতো কম হয়। আবার এই গ্রন্থির রস খুব বেশী পরিমাণে রক্তে মিশ্রিত হইতে থাকিলে, পরিশেষে অতিরিক্ত ঘর্মস্রাব ও শ্বাসক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়,

দুঃসাধ্য গলগণ্ড রোগ দেখা দেয় এবং মেয়েদের রজঃরোধ প্রভৃতি ব্যাধি প্রকাশ পায়। অবটু গ্রন্থির মতো আরো কয়েকটি নির্নালী গ্রন্থি আমাদের শরীরে আছে। সবগুলির পরিচয় দিতে গেলে ব্যাপারটা যেমন একটু অপ্রাসঙ্গিক হয়, পুঁথিও তেমনি বাড়িয়া যায়। সুতরাং তাহাতে বিরত হইতেছি।

আপাতত যে কয়টী গ্রন্থি আমাদের যৌবন ও লৈঙ্গবোধ-বিকাশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করে, সেই কয়টির কথা উল্লেখ করিয়া যাইব। এই গ্রন্থি কয়টির নাম :—

[পুরুষজাতির দেহে থাকে]	[স্ত্রীজাতির দেহে থাকে]
১। অবটু বা থাইরএড্	১। অবটু বা থাইরএড্
২। পার্থতীর্থক বা পিটুইটারী	২। পার্থতীর্থক বা পিটুইটারি
৩। অধিবৃক্কীয় বা সুপ্রারেনাল্	৩। অধিবৃক্কীয় বা সুপ্রারেনাল্
৪। পিঙ্গল বা পিনিঅ্যাল্	৪। পিঙ্গল বা পিনিঅ্যাল্
৫। মুষ্কযুগল বা টেস্‌টিজ্	৫। অণ্ডাশয়দ্বয় বা ওভারিজ্

প্রত্যেক নরনারীর বুকের মধ্যকার হাড়ের নীচে **বালখিল্য গ্রন্থি** (Thymus gland) নামক একটি গ্রন্থি থাকে। ওই গ্রন্থিটি আমাদের শিশুসুলভ সারল্য, চাপল্য ও অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। দশ-এগার বৎসর পর্যন্ত এই গ্রন্থিটি বেশ বড় থাকে, তারপর ক্রমশ ইহার আকার ছোট হয় এবং প্রয়োজনীয়তাও হ্রাস পায়।

কৈশোরের প্রারম্ভে (অর্থাৎ মোটামুটিভাবে মেয়েদের বারোয় ও ছেলেদের চৌদ্দয়) প্রবলতর হইয়া উঠে মস্তিষ্কের-কেন্দ্রভাগে-অবস্থিত **পিঙ্গল গ্রন্থি** (Pineal gland)। তখন যেন বালখিল্যে ও পিঙ্গলে বেশ একটা দ্বন্দ্ব সুরু হইয়া যায়। বালখিল্য গ্রন্থিরস চাহে মানবের দেহমনকে চিরবালক চিরহ্রস্ব রাখিতে, আর পিঙ্গল গ্রন্থিরস চাহে তাহার দুই তট কৈশোররূপ নবপ্রাবৃটের বন্যাজলে ছাপাইয়া দিতে। প্রায় সকল ক্ষেত্রে পিঙ্গল গ্রন্থির ললাটেই জয়তিলক শোভিত হয়। কৈশোরের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি ফুটিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই বালখিল্য গ্রন্থি যায় শুকাইয়া—চিরতরে পঙ্গু, অকর্মণ্য, শুষ্ক হইয়া।

পিঙ্গল গ্রন্থিরস তখন শরীরের রক্তস্রোতে ক্রমাগত মিশিয়া মিশিয়া দেহ-মনে কৈশোরসুলভ পরিবর্তনগুলি দ্রুত আনয়ন করে। অল্পদিনের মধ্যে জনন-যন্ত্রগুলি প্রতীয়মানত কিছু বাড়িয়া উঠে, উহার চারিপার্শ্বে সূক্ষ্ম রোমরাজি উদ্গত হইতে থাকে, পুরুষের গুম্ফে ও চিবুকে অল্প অল্প কেশোদ্গম হয়, স্ত্রীলোকের কুচযুগল উন্নত হইয়া উঠে, গলার স্বর অল্প-বিস্তর ভারি হইয়া যায়, বিপরীত যৌনধর্মীর প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন মৃদু আকর্ষণ জাগে ও এক স্বপ্নরঙ্গীন্ রামধনু চিত্তাকাশে প্রতিভাসিত হইয়া উঠে। আরো কত কি নূতন কল্পনা, আশা, আবেগ-চাঞ্চল্য পিঙ্গল গ্রন্থির কল্যাণে কিশোর-কিশোরীর হৃদয়-নাট্যমঞ্চে বিচিত্রবেশে সন্তর্পণে আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে।

তারপর বৎসর দুই-তিন পিঙ্গল গ্রন্থি আপনার অন্তঃস্রাব-দ্বারা দেহকে যথোপযুক্তরূপে পরিবর্তিত করিয়া দিয়া চিরকালের জন্য নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। তখন পুরুষ-দেহে মুষ্কদ্বয় ও স্ত্রীদেহে অণ্ডাশয়দ্বয় নবকর্ম-প্রেরণায় জাগিয়া, পিঙ্গলের অসম্পূর্ণ কর্তব্যভার স্কন্ধে তুলিয়া লয়। আপনারা বোধহয় অনেকেই জানেন যে, **মুষ্কযুগল** বা অণ্ডকোষের একটা বিশিষ্ট

বহিঃস্রাব আছে, উহার নাম বীর্য বা শুক্র। শুক্র বা বীর্যের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র, চক্ষুর অগোচর, কোটি কোটি শুক্রকীটাণু থাকে। প্রতিবার সঙ্গমে যেটুকু বীর্যক্ষয় হয়, তাহার মধ্যে এইরূপ কুড়ি-পঁচিশ কোটি কীটাণু থাকিতে দেখা যায়। কৈশোর-প্রারম্ভেই বীর্য ও তজ্জাতীয় রসসমূহ একটু একটু করিয়া প্রস্তুত হইতে থাকে। তা ছাড়া মুষ্কের ভিতরে Interstitial Cells of Leydig নামক কতকগুলি লম্বা ভাঁজ-করা খুব ছোট ছোট ছিদ্রময় কোষের মধ্যে এক প্রকার অন্তঃরসও তৈয়ারি হয়, যাহা যৌবন-সমাগমে অত্যন্ত সক্রিয় হইয়া উঠে এবং সারা দেহের রক্তস্রোতে মিশিয়া আমাদের দেহমনে যৌবনোচিত বৈশিষ্ট্যগুলি বিকশিত করিয়া তোলে।

স্ত্রীলোকের তলপেটের ঠিক মধ্যস্থলে—যোনিপথের শেষপ্রান্তে **জরায়ু** (Uterus) অবস্থিত। ক্ষুদ্র ঘণ্টাকার ও অনেকটা চ্যাপ্টা এই জরায়ুর ভিতরাংশ তলতলে ও ঈষৎ ফাঁপা। বৃক্ষবীজের মতো ইহার আভ্যন্তরিক গাত্রে জীবাঙ্কুর প্রোথিত হইয়া ভ্রূণদেহ সৃষ্ট ও পুষ্ট করে। জীবাঙ্কুর কি এখন বলি। জরায়ুর মাথার দুইদিকে দুইটি পেন্সিলের মত সরু মাংসময় নল আছে; নল দুইটির শেষপ্রান্ত প্রশস্ত ও ঝালরযুক্ত, যেন বহু অসম চঞ্চু-সমন্বিত। ঐ দুইটি নলপ্রান্তের নীচের দিকে পৌষপার্বণের সিদ্ধপিঠার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এক-একটি **অণ্ডাশয়** অবস্থিত। মৌচাকের মধুকোষের মতো হাজার কয়েক অতি ক্ষুদ্র কোষ বা গুহা সাজানো থাকে দুইটি অণ্ডাশয়ের উপরিতলে, এবং উহার সারা গাত্র থাকে অতি পাত্‌লা চামড়ার চাদরে মোড়া। কৈশোরাগমে যখন বালিকা প্রথম রজঃসন্দর্শন করে, তখন হইতে অণ্ডাশয়ের কাজ বাড়িয়া যায় এবং তাহার বাহ্যাভ্যন্তরে একাধিক অন্তঃরস প্রস্তুতির তাড়া পড়িয়া যায়।

অণ্ডাশয়ের উপরিভাগে চারিপার্শ্ব বেড়িয়া ঐ ক্ষুদ্র কোষগুলির মধ্যে থাকে কি? প্রত্যেক কোষে থাকে একটি

করিয়া অপরিণত অণ্ডাণু। কৈশোর-প্রারম্ভে রজোদর্শনের দুই-এক মাস পূর্ব হইতে বা সমসময় হইতে প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমা ৪৫।৪৬ বৎসর পর্যন্ত প্রতি চান্দ্রমাসে অর্থাৎ উনত্রিশ দিনে একবার একটি করিয়া অণ্ডাণু পরিপুষ্ট হয়। তখন উহার ঠিক উপরকার চাদরের মতো পাতলা আবরণীর ক্ষুদ্রাংশটুকু বুদ্বুদের মতো ফুলিয়া উঠিয়া, শেষে ফাটিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে পুষ্ট অণ্ডাণুটি মুক্ত হইয়া অণ্ডাশয়ের বাহিরে আসিয়া পড়ে। ঐসময় জরায়ু-সংলগ্ন সরু নলটির ঝালরযুক্ত কোমল চঞ্চু ঈষৎ অবনমিত হইয়া সেই মুক্ত অণ্ডাণুটিকে শুষিয়া নিজের মধ্যে টানিয়া লয়।

এই অণ্ডাণুই হইল স্ত্রীবীজ। ইহার সহিত পুরুষের একটিমাত্র শুক্রকীটাণুর সংযোগসাধন হইলেই জীবাঙ্কুরের সৃষ্টি হয়। জীবাঙ্কুরই জরায়ুগাত্রে প্রোথিত হইয়া ভ্রূণের সূত্রপাত করে।···কিন্তু গর্ভোৎপত্তির বৈজ্ঞানিক তথ্য সবিস্তারে বুঝাইতে যাওয়া এখানে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে। তবে এইটুকু জানিয়া রাখুন যে, পুরুষের শুক্রকীট হইতে স্ত্রীলোকের অণ্ডাণু আয়তনে তিন-চারি গুণ বড় হইলেও উহাকে স্থূলচক্ষে দেখিতে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন।

প্রতি চান্দ্রমাসে অণ্ডাশয়ের যে কোষটির মধ্য হইতে অণ্ডাণু 'সাবালক' হইয়া বাহির হইয়া যায়, সেই কোষটি খালি পড়িয়া থাকে না। তাহার চারিপার্শ্ব সঙ্গে সঙ্গে কুঁচকাইয়া ও শুকাইয়া ভিতরকার গর্তটি বুজিয়া যায় এবং ঐ গর্তের মধ্যে একপ্রকার হরিদ্রাভ বস্তু দানা বাঁধিয়া উঠে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ ইহার নাম দিয়াছেন *Corpus luteum*; আমরা উহার নাম দিয়াছি 'পীতপিণ্ড'।···এই পীতপিণ্ডের স্থায়িত্বকাল পনের-কুড়ি দিনের বেশী নহে। এই সময়ে নিজের মধ্যে সে একপ্রকার অন্তঃরস তৈয়ারি করে। তারপর আবার অন্য একটি অণ্ডাশয়িক কোষ সক্রিয় হইয়া উঠে এবং যথাসময়ে নূতন একটি পরিণত অণ্ডাণু বাহির হইয়া আসে। কোন অণ্ডাণু যদি শুক্রকীটের সহিত মিলিয়া গর্ভাধান

করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পরিত্যক্ত কোষের মধ্যে যে পীতপিণ্ড প্রস্তুত হয়, তাহা গর্ভকালের আগাগোড়া বেশ সক্রিয় অবস্থায় বিদ্যমান থাকে; এবং উহার অন্তঃরস ১৫।১৬ মাস পর্যন্ত মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ রাখিয়া গর্ভিণীর দেহাভ্যন্তরে ভ্রূণের বর্ধনোপযোগী নানারূপ আবশ্যকীয় পরিবর্তন সাধন করে।

তাহা ছাড়া, আধুনিক দেহবিজ্ঞানিগণ বলেন, অণ্ডাশয়ের অন্তঃস্থলে এক বা ততোধিক প্রকারের অন্তঃস্রাবের উৎস আছে, যাহা যৌবন-প্রারম্ভে উন্মুক্ত হইয়া স্ত্রীলোকের স্ত্রীসুলভ দৈহিক পরিবর্তনগুলির সূচনা করে—প্রতিষ্ঠা করে। বালকের মুষ্কদ্বয় বা বালিকার অণ্ডাশয়দ্বয় যদি কাটিয়া বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক লৈঙ্গধর্মীর যৌবনের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি (secondary sex characteristics) তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে না; একের দেহ সুস্পষ্ট মাংসপেশীময় ও অন্যের দেহ মেদসুলভ সুডৌল হয় না। মোট কথা, বালক যুবকত্ব পায় না—বালিকা যুবতীত্ব পায় না। অণ্ডাশয় দুইটি দেহমধ্য হইতে একেবারে কাটিয়া বাদ দেওয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও উহা যদি কাহারো দেহে বিদ্যমান থাকিয়া কিশোরকালে কোনরূপে ব্যাধিগ্রস্ত হয় বা শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলেও যৌবন-যাদুপুরীর দ্বার তাহার নিকট চিররুদ্ধ থাকিয়া যাইতে পারে। কিছুকাল কৈশোরত্ব ভোগ করিয়া হঠাৎ একদিন সে প্রৌঢ়ত্বের পথে পদার্পণ করে।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কোন কিশোরবয়স্ক পুরুষের অণ্ডকোষ বাদ দিয়া তৎপরিবর্তে যদি স্ত্রীলোকের অণ্ডাশয়ের খানিকটা কাটিয়া উহার দেহের যে-কোনস্থলে চামড়ার নীচে কলম বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার মধ্যে বিস্ময়করভাবে স্ত্রীসুলভ অবয়ব-বৈশিষ্ট্য ও যৌনবিষয়ক আচারব্যবহার পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এমন কি, স্ত্রীলোকের মত গলার স্বর, সলজ্জ চাহনি ও পদবিক্ষেপ, আত্মভাবগোপনের প্রয়াস, বেশভূষা-পরিপাট্য ও প্রসাধনের প্রতি অত্যধিক

আসক্তি, অর্ধবিকচ স্তনযুগ, শিশ্নদেহের ক্ষুদ্রতা, আংশিক লিঙ্গোত্থান-রাহিত্য, গুম্ফ ও শ্মশ্রুর অভাব, শুক্রাণুবহুল বীর্যের অনটন, নারীর প্রতি নিরাসক্তি প্রভৃতি ব্যাপারগুলি বেশ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়।

এই সূত্রে আর একটি সত্যের প্রতি পাঠকপাঠিকার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া গেলে বোধ হয় মন্দ হয় না। স্ত্রী বা পুরুষ—যতই স্বভাবসঙ্গত ও সুস্থ দেহমনের অধিকারী হউক না কেন, প্রত্যেকের সত্তার মধ্যে এককোণে প্রকৃতিদেবী অপর যৌনধর্মীর যৎসামান্য পরিমাণে বস্তু ও গুণ লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন। সেই বস্তু ও গুণের বীজ চিরকালই অস্পষ্ট, নিরঙ্কুরিত ও নিদ্রিত থাকিয়া যায় বটে; কিন্তু মাঝে মাঝে কোন ক্ষেত্রে একটা-আধটা ছোটখাটো ঘটনা অবলম্বন করিয়া, তাহার বিদ্যমানতার একটা অর্ধোস্ফুট আভাস আমাদিগকে জানাইয়া দেয়। লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, খুব স্বাভাবিক যৌনধর্মী বীরপুরুষও প্রণয়ঘটিত বা ক্ষুদ্র সাংসারিক ব্যাপারে হয়তো একএক-সময়ে একান্ত স্ত্রীসুলভ আচরণ করিয়া বসেন। কেহ কেহ সর্বতোভাবে স্বীয় লৈঙ্গজাতির অনুরূপ অকৃতিপ্রকৃতি পাইয়াও হয়তো একটা বিষয়ে চিরকালই বিজাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া যান; যথা, গোঁপ দাড়ি কামানো, মুখে স্নো-পাউডার মাখার অভ্যাস প্রভৃতি।

পুরুষের অণ্ডকোষের সহিত স্ত্রীলোকের অণ্ডাশয়ের একদিকে যেমন সৌসাদৃশ্য আছে, অন্যদিকে তেমনি পুরুষ-লিঙ্গের প্রতিমূর্তি হইল স্ত্রীলোকের **ভগাঙ্কুর** বা **ভগগুচ্ছ** (Clitoris)। এই উপাঙ্গটি মূত্রদ্বারের ঊর্ধ্বদেশে এক-টুকরা চামড়ার খাপের মধ্যে প্রায়-শায়িত ও লুক্কায়িত অবস্থায় থাকে। উহার অগ্রভাগ সরু, মূলদেশ অপেক্ষাকৃত মোটা; ইহা সাধারণত অর্ধ ইঞ্চির বেশী লম্বা হয় না। নারীর কামোদ্রেক হইলে, ভগগুচ্ছটি কঠিনাকার প্রাপ্ত হইয়া ঈষৎ প্রলম্বিত ও কঠিন হয় এবং ইহার মধ্য দিয়া তড়িতের ন্যায় একটা শক্তি প্রবাহিত হইয়া ইহাকে সূক্ষ্মভাবে স্পন্দিত করিতে থাকে।

নারীর কামাঙ্গ-প্রদেশের মধ্যে এইটি সর্বাপেক্ষা সুখানুভূতির আধার ও সংবেদনশীল (sensitive)। যে সকল স্ত্রীলোক একটু বেশী পুরুষ-ভাবাপন্ন, অথবা যাহারা এই উপাঙ্গটি বাল্য বা কৈশোর হইতে পুনঃপুনঃ নাড়িয়া চাড়িয়া অনৈসর্গিকভাবে কামচরিতার্থ করিতে থাকে, তাহাদিগের ভগাঙ্কুর একটু বেশ পুষ্ট ও ½ ইঞ্চি অপেক্ষা বেশ কিছু বড় হইতে পারে।

অবটু গ্রন্থির কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহা ছাড়া **পার্থতীর্থক ও অধিবৃক্কীয়** গ্রন্থিদ্বয়ও আমাদের যৌবন আনয়নে ও সংরক্ষণে অসাক্ষাৎভাবে সাহায্য করে। পার্থতীর্থকের বাসস্থান মস্তিষ্কের পাদভূমে, পিঞ্জল গ্রন্থির প্রতিবাসী সে। অধিবৃক্কীয় গ্রন্থিদ্বয় কোমরের মধ্যে নিম্নমেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে বৃক্কদ্বয়ের (kidneys) উপরিভাগে শিরস্ত্রাণের ন্যায় শোভিত। ইহাদের উপরিভাগের খোসা হইতে একপ্রকার এবং ভিতরকার মজ্জা বা শাঁস হইতে অন্যপ্রকার অন্তঃস্রাব বাহির হয়। অবটু, পার্থতীর্থক ও অধিবৃক্কীয় গ্রন্থিগুলির রস যদি স্বাভাবিক পরিমাণে কিশোর কাল হইতে নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে একদিকে জননযন্ত্রগুলি যেমন রীতিমতো পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, অন্যদিকে তেমনি যৌবনের অন্যান্য লক্ষণগুলিও পূর্ণপরিস্ফুট ও কর্মতৎপর হইয়া উঠে। তখন নবজাগ্রত যৌন সংস্কার, যৌবনোচিত উদ্যম, সাহস, তেজ, আত্মসংবিৎ, পরার্থপরতা, আত্মবিস্তার ও আত্মবিতরণের এষণা বা স্ত্রীজনোচিত দেহের গঠন-ভঙ্গিমা, বয়সোচিত লাবণ্য, প্রেম সম্বন্ধে জানিবার, শিখিবার ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভ করিবার দুর্দমনীয় আবেগ···ইত্যাদি বৃত্তিগুলি উপযুক্ত পাত্রে স্ব স্ব নির্দিষ্ট আসনে সভা সাজাইয়া বসে।···

জীবনের পূর্ণ জাগরণ হয় যৌবনে। এই কালটিতে শিব অপেক্ষা সুন্দরের পূজা চলে সব চেয়ে প্রগাঢ়ভাবে। যৌবনের মাদকতায় পৃথিবীর অনুতস্ব, জরা, মৃত্যু, দুঃখ, দুর্দৈব, সঙ্কীর্ণতা ও অপূর্ণতা যেন পশ্চাতের পটভূমিকায় সরিয়া

যায়। স্বপ্নরঙীন চক্ষে তখন যেন সব চেয়ে বড় হইয়া উঠে নিখিলজীবনের নিরবচ্ছিন্নতা, প্রেমের রহস্যময় বিশালতা ও সচেতন আত্মার অন্তহীন গভীরতা। নিতান্ত গদ্যময়, জ্ঞানহীন, কৃষ্টিবিমুখ লোককেও যৌবনকাল কিছুকালের জন্য একটু-না-একটু কবিভাবাপন্ন ও রসজ্ঞ করিয়া তুলে। নিতান্ত স্বার্থপর কঞ্জুস বস্তুতান্ত্রিককেও কিছু-না-কিছু পরার্থপর, দাক্ষিণ্যশীল করিয়া তুলে। অত্যন্ত আত্মস্থ বা লঘুচিত্তকেও দিন কয়েকের জন্য ভাবুক ও উন্মনা না করিয়া ছাড়ে না।

বিশ্বপ্রকৃতি তখন নূতন রূপ, বর্ণসম্পদ, নূতন ছন্দমঞ্জুষা, নূতন ভাবসম্পুট লইয়া তাহার নয়ন-সম্মুখে প্রতিভাত হয়। তখন অনেক যুবকের গায়েই কাননের গোলাপ-কামিনী-হাস্নাহানা-বকুল-রজনীগন্ধা বা শহরপথে-কেনা বেলার মালা রূপসীর পরশের মত' গায়ে লাগে; দক্ষিণা বাতাস "যেথা ছিল যত বিরহিনী, সকলের কুড়ায়ে নিঃশ্বাস" আসিয়া প্রাণে পুলক-শিহরণ জাগায়। নিজের অভিব্যক্তির শেষ সীমারেখার উপর দাঁড়াইয়া, সে "একোঽহং বহু স্যামি" এই স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্কল্পসিদ্ধির তপস্যায়োজনে সমস্ত প্রাণশক্তির সমুদ্র যেন মন্থিত, আলোড়িত করিয়া তুলে। একের নিকট হইতে যতখানি ভালবাসা সে পায়, তাহাতে যেন তাহার ক্ষুধা মেটে না; অপরকে যে প্রণয়সুধা ঢালিয়া দেয়, তাহা যেন তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইল না বলিয়া সংশয় জন্মে। প্রেমাস্পদের ঈষৎ ত্রুটিতে দারুণ অভিমান, নিজের কণামাত্র প্রমাদে দুরন্ত আত্মানুশোচনা।

একটু ব্যথা—একটু বিরহ—একটু অনাদরের ভারে তাহার সুকোমল প্রাণ-পল্লব যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে। অথচ দুরন্ত সাহসের বশে নিখিলের সৌন্দর্যকে সে খণ্ড খণ্ড করিয়া চিরিয়া দেখিতে চায়—তাহার অন্তরের মধুটুকু নিঃশেষে পান করিতে ব্যগ্র হয় সে। সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বার তাহার অনন্ত ভোগের বস্তু খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান্ হইয়া পড়ে।

তৃপ্তির মধ্যেও যেন কেমন একটা অতৃপ্তি—পুলকের মধ্যেও যেন একটা অকারণ বেদনার স্পন্দন—ব্যাপ্তির মধ্যেও যেন শীর্ণ সংহৃতির একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস! সেখানে একটুকরা সংগীত, যেখানে একবিন্দু সুগন্ধ, যাহার অন্তত একটা অঙ্গেও একটু লাবণ্যের ফুল্‌কি, যাহার অন্তরে নিজের চাহিদা-মাফিক গুণের বিন্দুমাত্র আভাস, তাহাকেই ঘেরিয়া দৃষ্টি-কিশলয়ের অজস্র শিহরণ—কল্পনা-মধুকরের অশ্রান্ত গুঞ্জন! তখন অন্তর-বাহিরে ধ্বনিয়া উঠে—"আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো!" "আমার মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা!" ইত্যাদি।

যৌবনের ভালবাসায় সাধারণত প্রাণের মিলন অপেক্ষা দেহের মিলনাবেগ থাকে অধিকতর প্রখর। তাই বৈষ্ণব-কবিদের সঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও তাঁহার ভরা যৌবনে প্রণয়িনীর প্রতি-অঙ্গের জন্য আপনার প্রতি-অঙ্গকে ক্রন্দনাকুল করিয়াছেন, তাহার নিটোল পেলব তনুলতার উপর আপনার ব্যাকুল কলেবরকে মূর্চ্ছিত করিতে চাহিয়াছেন। দেহ বা ইন্দ্রিয়-দ্বারা ভোগরাগে যতকাল বেশ একটু একঘেয়েমি, অবসাদ বা শ্রান্তি না আসে, ততক্ষণ ইন্দ্রিয়াতীত স্তরের খোঁজ পড়ে না। অবয়বের গভীর পরিচয় লইতে লইতে প্রাণলোকের প্রচ্ছন্ন পুরীর মধ্যে যতটুকু প্রবেশ করা যায়, ততটুকুই যথেষ্ট।—তারপর যৌবন-শেষে বা প্রৌঢ়ত্বের আবির্ভাবে পরস্পরের প্রাণরাজ্যের ভালো করিয়া আবিষ্কার চলে।

যুবক আপন প্রেমরাগমঞ্জু মনোমুকুরে আপনার দেহকে পূর্ণতর দেখে, অপরের রূপকে মহত্তোমহীয়ান্ দেখে। দেহ তাহার মুখ্য সাধনা, অন্তর গৌণ। সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শের মাঝে আপনাকে অকুণ্ঠিত-ভাবে দান,—এ যৌবনের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, প্রকৃতিগত প্রসক্তি। ইহাকে সংসারত্যাগী ব্রহ্মচারীর অগ্নিগর্ভ উপদেশ অথবা শিক্ষকমহাশয়ের সুমধুর প্ররোচনা কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করিতে—কতটুকু সংরুদ্ধ করিতে পারে?

তাই তো নবপ্রিয়া-সন্নিকটে কবিবর গাহিয়াছেন—

"হৃদয় লুকান আছে দেহের সাগরে,
চিরদিন তীরে বসি করিগো ক্রন্দন,
সর্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য-মাঝে হইব মগন।
আমার এ দেহ-মন চির রাত্রিদিন
তোমার সর্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।"

তৃতীয় প্রকোষ্ঠ—বিহার

পূর্বেই বলিয়াছি, পুরুষের কৈশোর আরম্ভ হয় মোটামুটি চৌদ্দয় এবং মেয়েদের বারোয়। প্রথমোক্তের যৌবন আরম্ভ হয় সাড়ে-সতরো বা আঠোরোয়, মেয়েদের হয় পুরা ষোলয়। ইহা হইল স্বভাবিক নিরীখ। ক্ষেত্র ও পাত্র বিশেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতেও পারে, অর্থাৎ যৌবন-সমাগম-কালের কিছু আগু-পিছু হইতে পারে। সাধারণের বিশ্বাস, যৌবন-প্রারম্ভ হইতেই আমরা প্রেম বলিতে যাহা বুঝি—তাহার বোধ ও আকাঙ্ক্ষা জন্মে এবং নারীর প্রতি নরের ও নরের প্রতি নারীর একটা স্পষ্ট আকর্ষণ প্রথম প্রবুদ্ধ হয়। কিন্তু এ ধারণা ভুল। প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষ জন্মকালে একটা

লৈঙ্গধর্মের ক্ষুদ্র বীজ আপনার সত্তা-মৃত্তিকার ভিতর লইয়া আসে এবং শৈশব হইতেই হয় সেই বীজের চুপিসাড়ে মন্থরভাবে অঙ্কুরোদ্গম। কৈশোরে মৃত্তিকার উপরে জাগিয়া উঠে বৃক্ষশিশু। তাহার পর নানা বিকাশ-ক্রমের মধ্য দিয়া হয় বিচিত্র রূপে-রসে লৈঙ্গধর্মরূপ বৃক্ষের পরিপুষ্টি ও পূর্ণ-পরিণতি।

শিশুর প্রেম

'কাম' বা 'প্রেম' কথাটার মধ্য হইতে একেবারে স্থূলভাবে লৈঙ্গিক সংযোগ জিনিসটাকে যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, শিশু মোটামুটিভাবে প্রেম করিতে পারে ও জানে। সে প্রেমের মধ্যেও তাহার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পিপাসা ক্ষুধিত ওষ্ঠপুট মেলিয়া জাগিয়া থাকে এবং সেই প্রেমের বর্ণপরিচয় হয় প্রথমে নিজের গৃহে। শৈশবে কাম বা লৈঙ্গধর্মীয় প্রেম থাকে শিশুর মনে বিচ্ছিন্ন ও অনির্দিষ্ট। তৎসম্বন্ধে তাহার বোধ থাকে অচেতনের লঘু মেঘমালায় সমাবৃত এবং ঔদরিক ক্ষুধার সহিত যেন অনেকখানি বিজড়িত। দুইটি বৃত্তি হয় একই প্রণালীতে প্রবাহিত। শিশু মুখ দিয়া যেমন পানাহার করে, তেমন অপরিস্ফুট লৈঙ্গক্ষুধারও তৃপ্তিসাধন করে। রসনার দ্বারা আস্বাদন ও হস্ত দ্বারা স্পর্শ,—এই দুইটি অনুভূতির মধ্য দিয়া তাহার কচি মনে হয় বাল-মদনের আদ্য জাগৃতি। সেইজন্য শিশু আত্মীয়-বান্ধবের নিকট হইতে যে চুম্বন ও আলিঙ্গনের স্পর্শ নিতান্ত অবোধ আবেগে—অধীর পুলকে পাইতে ও দিতে এত ভালবাসে—সেই দুইটিকে উত্তরকালে সত্যকার প্রেমচর্চায় শ্রেষ্ঠ স্থান না দিয়া পারে না। দুইটিরই প্রগাঢ়তর রূপ প্রেমিকপ্রেমিকার কাম-জীবনের আদ্য উপচার ও পরম কাম্যরূপে পরিগণিত হয়।

যাহা হউক, শৈশব-কৈশোরের লৈঙ্গবোধের স্বরূপ-বিশ্লেষণ বা তৎকালীন লৈঙ্গ-জীবন কিরূপে উন্মেষিত হয়,

তাহার বিবরণ এ পুস্তকের প্রতিপাদ্য নহে বলিয়া উহা এখানে দিলাম না ; কিন্তু যৌবনের প্রেমজীবন কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা বলিবার পূর্বে পাঠকপাঠিকাগণকে একটা কথা শুনাইয়া—অথবা স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি যে আমাদের দেশের প্রত্যেক বালকবালিকারাই লৈঙ্গবোধ ও লৈঙ্গিক সম্মেলন সম্বন্ধে একটা ভাবগত ধারণা এবং কাহারো কাহারো একটা বস্তুগত জ্ঞান বিবাহের বা যৌবনের বহু পূর্ব হইতেই জন্মে। এই অকাল-বোধনের মূলে থাকে সাধারণত বাটীর কোন দূরসম্পর্কীয় বর্ষীয়সী মহিলা, দাসদাসী, গৃহশিক্ষক, বিদ্যালয়ের বা পাড়ার কোন পরিপক্ক সহচর-সহচরী, পশুপক্ষীর প্রকাশ্য মিলন, থিএটার-সিনেমার আদিরসোচ্ছলিত দৃশ্যাবলী বা বাস্তব প্রেমের নাটকীয় বর্ণনাবহুল উপন্যাস···ইত্যাদি।

লৈঙ্গিক বিষয়ে অকালপক্কতার জন্য অনেক ক্ষেত্রে দায়ী বংশানুসারিতা (heredity), অর্থাৎ যে সকল পিতামাতার কামজীবন খুব অল্প বয়সে আরম্ভ হইয়াছে তাহাদের সন্তানেরা (শেষ বয়সের সন্তানেরা আরো নিবিড়ভাবে) অকালে কাম বিষয়ে কৌতূহলী ও তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানসংগ্রহে যত্নবান হয়। তদুপরি পিতামাতা ও বাড়ির আত্মীয়স্বজন অবোধ সুকুমার শিশু বলিয়া উপেক্ষা করিয়া, অপরের কামজীবনের কলঙ্ককাহিনী ও দুর্ঘটনা, দুশ্চরিত্রতা, নারীধর্ষণ, জননেন্দ্রিয়গত রোগ প্রভৃতি লইয়া বালকবালিকাদিগের সমক্ষে যে দিল্‌খোলা আলোচনা করেন এবং বাক্যে বা ব্যবহারে নিজেদের মধ্যে যে সকল কামবিষয়ক স্বাধীনতা গ্রহণ করেন, তাহাও অনেক সময় বালকবালিকার অকালপক্কতার পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। বাল-মন যেমন ভাবগ্রাহী ও কল্পনাপ্রবণ, তেমনি অনুসন্ধিৎসু ও অনুকরণপ্রিয়।

পাণিমেহন

যাহা হউক, যৌবনে স্ত্রীপুরুষ-সম্মিলন সম্পর্কে কয়েকটি ব্যবহারযোগ্য উপদেশ দিবার পূর্বে আর একটি বিষয় উল্লেখ

করিয়া যাওয়া কর্তব্য বলিয়া মনে করি। বালকের কৈশোর যখন দেহমনে পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় (অর্থাৎ প্রায় পনেরো বৎসর বয়সে) তখন আমাদের দেশের—তথা সমগ্র সভ্য জগতের ছেলেরাই পাণিমেহন (masturbation) বা অন্য কোনপ্রকার অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে বীর্যনিঃসারণে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে! অনেকেই অবশ্য অপরের দ্বারা এই অভ্যাসে দীক্ষিত হয়। কেহ কেহ আবার দৈবক্রমে আপনা-আপনি দীক্ষিত হয়। চৌদ্দ বৎসর বয়সের পূর্বেও কোন কোন বালককে স্বয়ং-রতির মোহগর্তে পতিত হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ আমার নিকট স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা আট-নয়-দশ বৎসর বয়সে পাণিমেহন সুরু করিয়াছিলেন এবং বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত একপ্রকার অপ্রতিহতগতিতে ও অসংশয়িতচিত্তে এই অভ্যাস বলবৎ রাখিয়াছিলেন।

বহু ব্যবসাবুদ্ধি-প্রণোদিত কবিরাজ, দুরভিসন্ধিপরায়ণ হাতুড়ে বৈদ্য, যথাতিরিক্ত কল্যাণকামী অথচ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ গুরুমহাশয়গণ—পাণিমেহনাদির কুফল সম্বন্ধে এক অতিরঞ্জিত ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত করিয়া ছাত্রসমাজে প্রচার করেন এবং যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের যাহা-কিছু দুর্ভোগের মূলে এই বিগত অভ্যাসটির অজুহাত তুলিয়া ধরেন! বহু দুর্বলচিত্ত সরলবিশ্বাসী যুবক—কবিরাজদিগের স্বপ্নদোষ ও ধাতুদৌর্বল্যের ঔষধের চটকদার বিজ্ঞাপন বা প্রচারপুস্তিকা পাঠ করিয়া ও নিজেদের কৈশোর-জীবনের কদভ্যাস স্মরণে আনিয়া অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে থাকে ; এবং কেহ কেহ পর্বত-প্রমাণ ঔষধ গিলিতে গিলিতে নিজেদের জীবন ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এক নৈরাশ্যজনক মনোবৃত্তির দাস হইয়া পড়ে।

বাল্যে হস্তমেহনের অভ্যাস শরীরমনের পক্ষে অতিরিক্ত ক্ষতিকর সন্দেহ নাই। কিন্তু কৈশোর ও প্রথম-যৌবনে মাত্রামতো ঐ অভ্যাস আচরিত হইলে, যতখানি ক্ষতি হয় বলিয়া আমরা আশঙ্কা করি, তাহা অমূলক। বর্তমান বৈজ্ঞানিক-

গণ মত প্রকাশ করেন যে, সম্পূর্ণ সুস্থদেহী কিশোর (অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেশে এই বয়স্ক ছাত্রদের শতকরা প্রায় ৩৬ জনই সুস্থ-পদবাচ্য নহে) যদি কিছুদিন ধরিয়া মাঝে মাঝে পাণিমেহন করে এবং তারপর কালক্রমে অন্তরোত্থিত নির্বেদ বা আত্মগ্লানি-বশে এই অভ্যাস চিরতরে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে শরীরের কিছুই ক্ষতি হয় না। উপরন্তু, যৌবনকালে যতদিন পর্যান্ত বিধিমতো স্ত্রী-সংসর্গের সুযোগ না আসে, ততদিন পর্যন্ত মাসে দুই-চারিবার পাণিমেহনের দ্বারা নিজের অদম্য কামাবেগ প্রশমন করা শারীরবিজ্ঞানের দিক হইতে এমন কিছু দোষাবহ নহে *।

অবশ্য এই অভ্যাস অল্প বয়স হইতে আরম্ভ হইয়া যাহাতে একটা দুত্যাজ্য ও নিত্যকৃত্য দীর্ঘস্থায়ী নেশায় পর্যবসিত না হয়, তাহাই দেখিতে হইবে। লেখকের সংস্পর্শে এমন কয়েকজন পুরুষ আসিয়াছেন, যাহারা চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত এই অভ্যাসের ক্রীতদাস হইয়া রহিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে দুইজন বিবাহিত। স্ত্রী-সংসর্গ করিয়া তাঁহারা ততখানি তৃপ্তি পান না, যতটা এই স্বরতিতে পান। অনেক সময় পত্নীসঙ্গ-লাভে পূর্ণপরিতৃপ্তি না পাইয়া, তাঁহারা সহবাসের অব্যবহিত পরেই একান্তে গিয়া পাণিমেহন করেন,—একথাও একজন স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহা আবাল্যসংক্রামিত একপ্রকারের উৎকট ব্যাধি বিশেষ।

* The *occasional* indulgence is not injurious, and if it could always be kept within proper bounds, it would not be necessary to make a fuss about *it* and devote reams of paper to the description of its evils."—**W. J. Robinson** in *Sex Knowledge for Men*, page 46. In the case of those who have reached the age of puberty, masturbation *within very moderate limits* in many constitutions does not seem to produce apparent harm."—**Dr. K. C. Bose** in *Sex Hygiene*, p. 44.

বাল্যে বা কৈশোরে বহুকালব্যাপী অতিরিক্ত আত্মমেহনকারী পুরুষের লিঙ্গ ও মুষ্কদ্বয় বহুক্ষেত্রে ক্ষুদ্রাকার হয়, যৌবনে বা প্রৌঢ়কালে রমণকালে লিঙ্গ যথোচিত কঠিনতা প্রাপ্ত হয় না, এবং বীর্যস্খলন অপেক্ষাকৃত সত্বর সাধিত হয়—এইরূপ একটা গুরুতর অভিযোগের মূলে কিছু সত্য নিহিত আছে। শিশুকাল হইতে যাহারা 'ম্যাদামারা,' যাহারা 'ভয়কাতুরে,' যাহারা রুগ্ণ, যাহারা উপযুক্ত ব্যায়াম-বিমুখ, কিছুকাল তাহারা এই অভ্যাসের পর আজীবন স্মৃতিশক্তি-হ্রাস ও হৃদ্দৌর্বল্য রোগে ভুগিতে পারে। এই উপসর্গগুলি অবশ্য আরো জটিল ও দৃঢ়মূল হয়—যদি উহারা কৃতকর্মের জন্য কেবলি ঘোরতর অনুশোচনা, আত্মদ্বন্দ্ব ও ভীতিবিহ্বলতার ভাব মনে মনে পোষণ করিতে থাকে।

বীর্যের উৎপত্তি—উপচয় ও অপচয়

পনেরো বৎসর বয়সের প্রারম্ভ হইতে অর্থাৎ যে সময় বালখিল্য গ্রন্থি নির্জীব হইয়া পিঙ্গল ও লৈঙ্গগ্রন্থির (অর্থাৎ মুষ্কদ্বয় বা অণ্ডাশয়দ্বয়ের) উপর দেহরাজ্যের দায়িত্ব ছাড়িয়া দেয়, তখন মুষ্কের কোষগুলির মধ্যে একদিকে শুক্রকীটাণু প্রস্তুত হইতে—অন্যদিকে উহার বিশেষ অন্তঃস্রাবটি রক্তস্রোতে ক্রমাগত মিশিতে থাকে। মূত্রস্থলীর (bladder) দুইপার্শ্বে সংস্থিত 'বীর্যাধার' নামক যে দুইটি ক্ষুদ্র থলি আছে, তাহার মধ্যে ঈষৎ হরিদ্রাভ গাঢ় বীর্যরস প্রস্তুত হইয়া প্রতিনিয়ত একটু একটু করিয়া জমিতে থাকে। অণ্ডকোষের মধ্যে নিয়ত জায়মান লক্ষ লক্ষ শুক্রকীটাণু দুইটি বিশিষ্ট নল-সাহায্য এই বীর্যাধারের মধ্যে উঠিয়া আসে, এবং বীর্যাধারের রসের সহিত সংমিলিত হইয়া মূত্রনালী-পথে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত থাকে। জননযন্ত্রের মধ্যে আরো তিন প্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সনালী গ্রন্থি আছে। প্রতিবার বীর্যপতনের সময় এই গ্রন্থিগুলি হইতেও বিশেষ বিশেষ রস ক্ষরিত হইয়া আসল বীর্যের সহিত সম্মিলিত হয়। প্রতিবার সঙ্গমে তখনকার

মতো একদিকের বীর্যাধার অনেকটা খালি হইয়া যায়। দ্বিতীয় বারে অন্যদিকের বীর্যাধার এইভাবে খালি হয়। দুই দিন বা তাহার কিছু বেশী সময়ের মধ্যে উহা পুনরায় প্রায় পূর্ণ হইয়া উঠে। একইরাত্রে তৃতীয়বার বা চতুর্থবার সঙ্গমে দুই-চারি বিন্দু মাত্র বীর্য এবং অন্যবিধ পাতলা রস নির্গত হইতে দেখা যায়। পঞ্চমবারে হয়ত কিছুই নির্গত হয় না। প্রতিবারের স্খলিত বীর্যে ১০—২৫ কোটি শুক্রাণু থাকে।

কৈশোরের মাঝামাঝি হইতে যৌবনে যতদিন পর্যন্ত মানুষ স্থায়িভাবে স্ত্রীসঙ্গ প্রাপ্ত না হয়, ততদিন পর্যন্ত নিদ্রাকালে, স্বপ্নে, অথবা জাগ্রৎ অবস্থায় প্রগাঢ় কামচিন্তার ফলে মাঝে মাঝে বীর্যস্খলন হওয়া তাহার শরীরের পক্ষে আদৌ অহিতকর নহে। এই অনিচ্ছাকৃত বীর্যপাতে শরীর-মন-নীতি-ধর্ম সব কিছু রসাতলে গেল বলিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে বসিবার প্রয়োজন নাই। সুস্থ সবল কিশোর বা যুবকের মাসে দুই-তিন-চারিবার করিয়া স্বপ্নদোষ হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নহে। ইহার জন্য মহাপ্রাণীকে দুই ঠোঁটে সভয়ে চাপিয়া ধরিয়া, তাড়াতাড়ি কোন কবিরাজী বা হেকিমী দাওয়াইয়ের শরণ লইতে মুক্তকচ্ছ হইয়া দৌড়ানো মহামূর্খতার পরিচায়ক।

প্রকৃতি অতিপ্রাচুর্যে যখন নিত্য ভরিয়া উঠিতেছে, তখন সামান্য অপব্যয়ে কিছু আসিয়া যায় না। এবং অনেকেরই এইরূপ বীর্যক্ষয়ের পর শরীর বেশ ঝরঝরে, চিত্ত হালকা ও মন কর্মোন্মুখ বলিয়া বোধ হয়। কষ্টকর সঙ্কল্প ও চেষ্টার দ্বারা ক্রমাগত শুক্রধারণের ফলে, উহার অতি সামান্য অংশ আমাদের রক্তপ্রবাহে আশোষিত হইয়া দেহের যৎকিঞ্চিৎ উন্নতি বিধান করে বটে; কিন্তু বেশীর ভাগই যায় আমাদের জ্ঞাত-বা-অজ্ঞাতসারে প্রস্রাবের সহিত অথবা স্বপ্নসঙ্গমের ফলে নির্গত হইয়া।

তদুপরি, আর এক কথা। জাগ্রৎ অবস্থায় যে পরিমাণ বীর্যক্ষয় হয়, নিদ্রিত অবস্থায় খুব কামোত্তেজিত হইলেও তাহার বেশী তো হয়ই না, বরং সাধারণ ক্ষেত্রে কম হইতেই দেখা যায়। একথাও সত্য যে, সঙ্গমকালে যে শারীরিক ব্যায়াম বা চেষ্টা সাধিত হয়, তাহার শতাংশের একাংশ ও স্বপ্নদোষে থাকে না।...সুতরাং ভয় নাই। মাসে ৩ বার স্বপ্নদোষ রতিবিরত সুস্থ যুবকের পক্ষে ক্ষতিকর নহে। কঠোর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীও প্রথম কিছুকাল ইহার হাত হইতে নিস্তার পান্ না।

স্ত্রীলোকের যোনিদেশীয় নিঃস্রাব

সৌভাগ্যের বিষয়, মেয়েদের শরীরে পুরুষাঙ্গরূপ কোন বীর্য নাই এবং কোন অরমিতা কুমারীই স্বপ্নদোষের ন্যায় কোন উপসর্গ উপস্থিত হইতে দেখা যায় না। রমণের প্রারম্ভ হইতে অথবা রমণ ব্যতীত গভীর কামাবেগ বা একনিষ্ঠ কামচিন্তার ফলে মেয়েদের যোনিদ্বারের সন্নিকটে অবস্থিত বার্থোলীন ও স্কীন্ গ্রন্থিসমূহ হইতে একপ্রকার ঈষৎ আঠাল রস নির্গত হইয়া, ভিতরের দিকে গড়াইয়া যায়। ইহাছাড়া যোনি-প্রাচীর চুয়াইয়া একপ্রকার ঘর্মবৎ পদার্থ যৎসামান্য মাত্রায় নিয়ত নির্গত হইতে থাকে। এই রস যোনিনালীর মধ্যে সর্বদা বর্তমান থাকিয়া উহাকে সিক্ত ও পিচ্ছিল অবস্থায় রাখে; নচেৎ চলাফেরা বা নিম্নাঙ্গের ক্রমাগত নড়াচড়ায় যোনিপ্রাচীর ঘৃষ্ট, পিষ্ট ও ব্যথিত হইয়া পড়িত। যাহা হউক, নারীর এই সকল যোনিদেশীয় রসে শুক্রকীটের ন্যায় কোন জীবন্ত পদার্থ তো নাই-ই, অপিচ পুরুষের বীর্যে ফস্ফেট, লেসিথিন-গ্লোবিউল, অ্যামিলয়েড প্রভৃতি যে সকল উপাদান দেখা যায়, তাহা ইহাদের রসে একেবারেই থাকে না। সুতরাং বীর্যক্ষয়ে পুরুষের দেহ-সংসারের যেটুকু ক্ষতি হয়, তাহার বিশ ভাগের এক ভাগও নারীর যোনিরস-নিষেকে ঘটিতে পারে না। এ বিষয়ে নারী অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।

যে সকল নারী অপেক্ষাকৃত অধিকক্ষণ ধরিয়া রমণসুখ ভোগ করিতে পান, কখনো কখনো চরমানন্দের সমসময়ে তাঁহাদের জরায়ু-মুখ চুঁয়াইয়া আর এক প্রকার রস নিসৃত হয়; ইহার আকৃতি ও প্রকৃতি অনেকটা আমাদের মুখলালার মতো। ইহার নাম "বিসৃষ্টি-রস"। প্রতি রমণের শেষেই অথবা ইতিহর্ষ লাভের সময়েই যে বিসৃষ্টি-রস নির্গত হইবে—এমন কোন কথা নাই। একটি রমণ আশাতীতভাবে বিলম্বিত হইলে অতিরিক্ত কামার্তা রমণীর পরপর দুই-তিনবার ইতিহর্ষ ঘটিতে পারে, কিন্তু বিসৃষ্টি-রস ক্বচিৎ দুইবারের বেশী নির্গত হয়। এমন রমণী আমাদের দেশে ও অন্যান্য দেশে যথেষ্ট সংখ্যক আছেন—যাঁহাদের সারা বিবাহিত জীবনের মধ্যে ইতিহর্ষ লাভ করিবার কিংবা বিসৃষ্টি-রসপাতের সৌভাগ্য আদৌ ঘটে নাই। মাঝামাঝি কামশীলা রমণীর একবার বিসৃষ্টি-রস নির্গত হইবার পর রতিক্রিয়া আর পরিচালন তাহাদের নিকট উপভোগ্য হয় না। শুধু স্বামী বা প্রেমিককে তৃপ্তি দিতে দুই-চারি মিনিট কাল তাঁহারা চুপ চাপ্ থাকেন, তাহার পর তাঁহারা একদিকে যেমন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন—অন্যদিকে তেমনি বিরক্তি বোধ করেন।

আবার কোন কোন রমণী কামক্রিয়ায় রীতিমতো অভ্যস্ত হইবার পর এবং যৌন ব্যাপারে অল্পবিস্তর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলে, কোন সময় তাঁহাদের চরমতৃপ্তিকালে জরায়ু ফাঁক হইয়া গ্রীবা-মধ্য হইতে একপ্রকার অর্ধকঠিন-অর্ধতরল প্রদীপের সলিতার মতো পদার্থ (Kristeller's slimy plug) নির্গত হইয়া থাকে। এই ঘননিঃস্রাব বড় সহজে বহির্গত হয় না—কেহ দেখিতেও পায় না। পুরুষলোক এই ঘননিঃস্রাব সম্বন্ধে কোন স্পর্শানুভূতিও লাভ করে না। কিন্তু রমণীর কামসুখানুভূতি ইহাতে চরমে গিয়া পৌঁছে, ইহার মধুময় স্মৃতি বহুকাল তাহার মনে নীড় রচনা করিয়া থাকে।...মনে থাকে যেন, গর্ভোৎপাদনের সহিত কিন্তু উহার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নাই।

কোনো কোনো লম্পট পুরুষ যে বন্ধু-মহলে সগর্বে বিগত রজনীর বিহার-কাহিনীর সাড়ম্বর বর্ণনা দিতে গিয়া স্ফীতবক্ষে কহিয়া থাকেন—তিনি একেবারের রুদ্র রমণে রমণীর তিন, চারি বা পাঁচবার কাম-সলিল ক্ষরণ করাইয়া তবে তাহাকে অব্যাহতি দিয়াছেন, তাহা হয় অবিমিশ্র মিথ্যা, নতুবা তাঁহাদের ঘোর অজ্ঞতার পরিচায়ক বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

সম্ভোগের কালাকাল

কত অল্পবয়সে মানুষ ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ আরম্ভ করিতে পারে—এই প্রশ্ন লইয়া এতকাল বহু বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছে এবং এখনো হইয়া থাকে। পুরুষের সাড়ে-সতেরো বা আঠারো, মেয়েদের সাড়ে-তেরো বা চৌদ্দ বৎসর হইতে নিয়মিতভাবে ইন্দ্রিয়সেবা করিলে শরীরের তেমন কিছু ক্ষতি হয় না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বারো-তেরো বৎসরের বালক ও নয়-দশ বৎসরের বালিকার যৌনসম্মিলন প্রায়ক্ষেত্রে সাধ্য হইলেও অনুমোদ্য নহে। এরূপ দৃষ্টান্ত পূর্বে মাঝে মাঝে দেখা যাইত, এখনো ক্বচিৎ দেখা যায়। উভয়ের সম্মতিতে সংঘটিত হইলেও ইহাতে শরীরের যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা। এইরূপ অভ্যাসে শরীরের স্বাভাবিক রোগ-প্রতিরোধ-শক্তি হ্রাস পায়, বিশেষভাবে যৌবন পূর্ণপরিস্ফুট হইতে পারে না এবং অকালবার্ধক্য অনায়াসে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করে।

বিবাহ না করিয়া শতকরা নিরানব্বই জন যুবক যে সকল অবৈধ উপায়ে রেতঃপাত করে, তদপেক্ষা স্ত্রীসংসর্গ শ্রেয়স্কর সন্দেহ নাই। আর্থিক বা অন্যবিধ কারণে ঠিক্ যৌবনের প্রারম্ভে হয়তো সকলের পক্ষে বিবাহ করার সুবিধা হয় না। অথচ অনেকগুলি কারণে মেয়েদের তো নয়ই—পুরুষদিগের বহির্বিবাহিক্ সঙ্গম (অথবা বারবনিতালয়ে গিয়া

লালসাপ্রণোদন) আমরা সমর্থন করি না। বেশ্যাই হোক্ বা ভদ্রকন্যাই হোক, যাহারা এইভাবে যুবকদিগকে বস্তুগত প্রয়োজনীয়তার খাতিরে কাম-চরিতার্থতার সুযোগ দান করে, তাহাদের মধ্যে—প্রথমত আসল প্রেমের স্থান আদৌ থাকে না; নতুবা তাহা যেমন অগভীর তেমনি ক্ষণস্থায়ী হয়। দ্বিতীয়ত, এই দুই জাতীয়া রমণীর নিকট হইতে রতিজ ব্যাধি (Venereal diseases) সংক্রামণের সবিশেষ সম্ভাবনা থাকে। তদুপরি অন্যান্য মানসিক অসাচ্ছন্দ্য, অপযশ ও দুর্ঘটনার জন্যও উভয় পক্ষকে প্রস্তুত থাকিতে হয়।

পুরুষ চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যে ও নারী সতেরো-আঠারোর মধ্যে পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহার স-মস্তিষ্ক দেহবিধান চরম-পরিণতি-লাভ করে। ওই সময় পর্যন্ত যে অল্পায়াসে কাম দমন করিয়া থাকিতে পারে, তাহার যৌবন একদিকে দীর্ঘস্থায়ী—অন্যদিকে স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত অটুট হয়। আমাদের দেশের নারীর পক্ষে লৈঙ্গ-সম্মিলনে রত হইবার শ্রেষ্ঠকাল ষোল হইতে আঠারো বৎসর বয়স। এই সময়ের মধ্যে যাহারা পুরুষ সংসর্গ পায়, তাহাদের যৌবনের স্থায়িত্ব বিলম্বিত হইতে পারে। কিন্তু আঠারোর যত বেশী দিন পরে যাহাদের অদৃষ্টে রতিতৃপ্তির সুযোগ ঘটে, তাহারা তত তাড়াতাড়ি যৌবন হারাইতে বসে। কুড়ি-একুশ বৎসর বয়সের পূর্বে একটি-দুইটি গর্ভধারণে যে সকল বিবাহিতা নারীর যৌবনের সৌন্দর্য অনেকটা ম্লান হইয়া গেল বলিয়া মনে হয়, তাহারা ঐ বয়স পর্যন্ত অরমিতা কুমারী থাকিলে যে তদপেক্ষা বেশী লাবণ্য বিসর্জন দিয়া ফেলিতে পারে—তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না!

আমরা অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিয়াছি যে, ভারতে কন্যা-বিবাহ দিবার উপযুক্ত সময় চৌদ্দ হইতে ষোল বৎসর বয়সের মধ্যে। অসমর্থ-পক্ষে ষোল হইতে আঠারো। পুরুষের বিবাহের বয়স বাইশ হইতে ছাব্বিশ; অসমর্থ-পক্ষে

উনত্রিশ বৎসর পর্যন্ত বিলম্ব করা চলে। ইহার পর যাহারা বিবাহ করে, তাহারা দেহসম্ভোগ করে বটে, কিন্তু বোধ হয় অর্ধেকের অধিক লৈঙ্গ-সুখভোগ হইতে বঞ্চিত হয়।

কোন্ বয়সে—কতবার

ইহার পরই একটা প্রশ্ন অনেকের মনে জাগে যে, কোন্ বয়সে কতবার মৈথুন করিলে, তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে বা যৌবনের পক্ষে হানিজনক হয় না। এ বিষয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে এবং থাকাটা কিছু বিচিত্র নহে। দেশ, কাল, পাত্র ও একই পাত্রের বয়স-বিশেষে ইহার তারতম্য ঘটা স্বাভাবিক। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ অপেক্ষা শীতপ্রধান দেশের লোকের একদিকে যেমন স্বাস্থ্য ভাল, অন্যদিকে তেমনি যৌবনও অধিকদিন স্থায়ী হয়। সুতরাং প্রথমোক্ত অপেক্ষা দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তিরা অধিক পরিমাণে বা বহুদিন ধরিয়া কামচর্চা করিতে পারে।

শরৎ ও বসন্তকালে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই বেশী কামাতুর হয়। অতি-শীতে ও অতি-গ্রীষ্মে সকলেরই লালসা-তটিনীতে ভাঁটা পড়ে। বর্ষাকালে অল্পবয়স্ক প্রেমিক-প্রেমিকা বেশ একটু উত্তপ্ত হইয়া উঠে, এবং বিরহ-জ্বালা উগ্রভাবে অনুভব করে। বৃদ্ধ অপেক্ষা স্বাস্থ্যবান যুবকগণ, শ্বেতকায় জাতি অপেক্ষা তুর্ক, আরবীয়, ইহুদি ও কাফ্রীগণ, মদ্যপ অপেক্ষা গঞ্জিকা-সেবীরা, অতিসংযমী পালোয়ান অপেক্ষা সাধারণ গৃহস্থেরা, নিরামিষভোজী অপেক্ষা মাংসভোজীরা, স্থূল অপেক্ষা শীর্ণ-কায় ব্যক্তিরা, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীগণ, দীর্ঘাঙ্গী অপেক্ষা খর্বদেহী তরুণীগণ—সম্ভোগ-শ্রম সাধারণত বেশী সহিতে পারে।

এস্থলে একটা কথা জানিয়া রাখা ভাল যে, রমণে পুরুষের যতটা স্বাস্থ্য ও শক্তি নষ্ট হয়, নারীর তাহার চারি ভাগের এক ভাগও হয় না। আবার, পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণে নারীর যে সৌন্দর্য-হানির সম্ভাবনা, অতিরিক্ত বা পুনঃ পুনঃ

লালসাপ্রণোদন) আমরা সমর্থন করি না। বেশ্যাই হোক্ বা ভদ্রকন্যাই হোক, যাহারা এইভাবে যুবকদিগকে বস্তুগত প্রয়োজনীয়তার খাতিরে কাম-চরিতার্থতার সুযোগ দান করে, তাহাদের মধ্যে—প্রথমত আসল প্রেমের স্থান আদৌ থাকে না; নতুবা তাহা যেমন অগভীর তেমনি ক্ষণস্থায়ী হয়। দ্বিতীয়ত, এই দুই জাতীয়া রমণীর নিকট হইতে রতিজ ব্যাধি (Venereal diseases) সংক্রামণের সবিশেষ সম্ভাবনা থাকে। তদুপরি অন্যান্য মানসিক অসাচ্ছন্দ্য, অপযশ ও দুর্ঘটনার জন্যও উভয় পক্ষকে প্রস্তুত থাকিতে হয়।

পুরুষ চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যে ও নারী সতেরো-আঠারোর মধ্যে পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহার স-মস্তিষ্ক দেহবিধান চরম-পরিণতি-লাভ করে। ওই সময় পর্যন্ত যে অল্পায়াসে কাম দমন করিয়া থাকিতে পারে, তাহার যৌবন একদিকে দীর্ঘস্থায়ী—অন্যদিকে স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত অটুট হয়। আমাদের দেশের নারীর পক্ষে লৈঙ্গ-সম্মিলনে রত হইবার শ্রেষ্ঠকাল ষোল হইতে আঠারো বৎসর বয়স। এই সময়ের মধ্যে যাহারা পুরুষ সংসর্গ পায়, তাহাদের যৌবনের স্থায়িত্ব বিলম্বিত হইতে পারে। কিন্তু আঠারোর যত বেশী দিন পরে যাহাদের অদৃষ্টে রতিতৃপ্তির সুযোগ ঘটে, তাহারা তত তাড়াতাড়ি যৌবন হারাইতে বসে। কুড়ি-একুশ বৎসর বয়সের পূর্বে একটি-দুইটি গর্ভধারণে যে সকল বিবাহিতা নারীর যৌবনের সৌন্দর্য অনেকটা ম্লান হইয়া গেল বলিয়া মনে হয়, তাহারা ঐ বয়স পর্যন্ত অরমিতা কুমারী থাকিলে যে তদপেক্ষা বেশী লাবণ্য বিসর্জন দিয়া ফেলিতে পারে—তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না!

আমরা অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিয়াছি যে, ভারতে কন্যা-বিবাহ দিবার উপযুক্ত সময় চৌদ্দ হইতে ষোল বৎসর বয়সের মধ্যে। অসমর্থ-পক্ষে ষোল হইতে আঠারো। পুরুষের বিবাহের বয়স বাইশ হইতে ছাব্বিশ; অসমর্থ-পক্ষে

উনত্রিশ বৎসর পর্যন্ত বিলম্ব করা চলে। ইহার পর যাহারা বিবাহ করে, তাহারা দেহসম্ভোগ করে বটে, কিন্তু বোধ হয় অর্ধেকের অধিক লৈঙ্গ-সুখভোগ হইতে বঞ্চিত হয়।

কোন্ বয়সে—কতবার

ইহার পরই একটা প্রশ্ন অনেকের মনে জাগে যে, কোন্ বয়সে কতবার মৈথুন করিলে, তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে বা যৌবনের পক্ষে হানিজনক হয় না। এ বিষয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে এবং থাকাটা কিছু বিচিত্র নহে। দেশ, কাল, পাত্র ও একই পাত্রের বয়স-বিশেষে ইহার তারতম্য ঘটা স্বাভাবিক। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ অপেক্ষা শীতপ্রধান দেশের লোকের একদিকে যেমন স্বাস্থ্য ভাল, অন্যদিকে তেমনি যৌবনও অধিকদিন স্থায়ী হয়। সুতরাং প্রথমোক্ত অপেক্ষা দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তিরা অধিক পরিমাণে বা বহুদিন ধরিয়া কামচর্চা করিতে পারে।

শরৎ ও বসন্তকালে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই বেশী কামাতুর হয়। অতি-শীতে ও অতি-গ্রীষ্মে সকলেরই লালসা-তটিনীতে ভাঁটা পড়ে। বর্ষাকালে অল্পবয়স্ক প্রেমিক-প্রেমিকা বেশ একটু উত্তপ্ত হইয়া উঠে, এবং বিরহ-জ্বালা উগ্রভাবে অনুভব করে। বৃদ্ধ অপেক্ষা স্বাস্থ্যবান যুবকগণ, শ্বেতকায় জাতি অপেক্ষা তুর্ক, আরবীয়, ইহুদি ও কাফ্রীগণ, মদ্যপ অপেক্ষা গঞ্জিকা-সেবীরা, অতিসংযমী পালোয়ান অপেক্ষা সাধারণ গৃহস্থেরা, নিরামিষভোজী অপেক্ষা মাংসভোজীরা, স্থূল অপেক্ষা শীর্ণ-কায় ব্যক্তিরা, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীগণ, দীর্ঘাঙ্গী অপেক্ষা খর্বদেহী তরুণীগণ—সম্ভোগ-শ্রম সাধারণত বেশী সহিতে পারে।

এস্থলে একটা কথা জানিয়া রাখা ভাল যে, রমণে পুরুষের যতটা স্বাস্থ্য ও শক্তি নষ্ট হয়, নারীর তাহার চারি ভাগের এক ভাগও হয় না। আবার, পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণে নারীর যে সৌন্দর্য-হানির সম্ভাবনা, অতিরিক্ত বা পুনঃ পুনঃ

রমণে তদপেক্ষা কম সৌন্দর্যহানি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বে সহবাসে পুরুষ অপেক্ষা নারীর ক্ষতি হয় খুব বেশী এবং সেই ক্ষতি সাম্‌লাইতে পুরুষ অপেক্ষা নারীর বিলম্ব হয় অধিক; আমাদের দেশে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রমণপ্রাক্কালে খুব কম পুরুষই স্ত্রীর অনুমতি অথবা ইচ্ছা-অনিচ্ছার অপেক্ষা রাখে।

যাহা হউক, সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে যৌবনে কতবার রমণ করা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত, তাহার একটা নীরিখ্ তৈয়ার করিতে গেলে বলিতে হয়, সারা যৌবনকালে সপ্তাহে তিনবারের বেশী নহে। বিবাহের প্রথম প্রথম দুই-তিন বৎসর কাল ইহাপেক্ষা একের বা উভয়ের তাগিদ্ বেশী হইতে পারে। কিন্তু নবীন দম্পতিদিগকে শুধু একটা উপদেশ দেওয়া সমীচীন মনে করি যে, কোনদিনই দুইবারের বেশী রতিচর্যা যেন না হয় এবং প্রতিসপ্তাহে অন্তত পুরা একদিন (২৪ ঘণ্টা কাল) জননযন্ত্রকে বিশ্রাম দেওয়া চাই।

যাঁহারা অতি সহজে কামোত্তজনশীল, তাঁহাদিগকে বলি, বিবাহের ২।৩ বৎসর নতুবা একটি সন্তান জন্মিবার পর হইতে তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী যেন পৃথক শয্যায় শয়ন করেন। সঙ্গতিতে কুলাইলে পৃথক কক্ষে শুইতে পারিলে আরো ভালো হয়। নিত্য ও সারারাত্র একশয্যায় নিত্য-নূতনত্বের আবেশ-ভরা romantic ভাবটি নষ্ট করে। উহা স্বাস্থ্যের পক্ষেও অনিষ্টকর, প্রকারান্তরে পরমায়ুহারকও বটে। তদুপরি, অসংবৃত অবস্থায় ঘনসংলগ্ন পিতামাতার নিদ্রা-দৃশ্য অতি কচি শিশুর মনেও যৌনভাবের বীজ অকালে অঙ্কুরিত করিয়া দিতে পারে। কিশোর-কিশোরীর তো কথাই নাই।

কামসংসর্গ যেন আফিংখোরের নেশার মতো একটা কদভ্যাসে দাঁড়াইয়া না যায়। সত্যকার একটা অসংবরণীয় আন্তরিক প্রেরণায় ও উভয়পক্ষের সম্পূর্ণ সম্মতিতে উহার চর্চা হওয়াই সকল দিক্ দিয়া কল্যাণজনক। সেইজন্য

উভয়েরই 'এই কয়দিন কিছুতেই সহবাস করিব না' এইভাবের একটা দৃঢ়সংকল্প মনে গ্রথিত করিয়া, তাহা পালনে যত্নবান হওয়া উচিত। নতুবা মাঝে মাঝে পরস্পরের মধ্যে কিছুদিনের বিচ্ছেদ ঘটানো বাঞ্ছনীয়। অতিরিক্ত বা নিরবচ্ছিন্ন বাস্তব প্রেমে মাধুর্য, কমনীয়তা ও আকর্ষণীয়তা শীঘ্র কমিয়া যায়; মন একঘেয়েমি ও সৌহিত্যে ভরিয়া উঠে।...

তারপর আর এক কথা। লৈঙ্গসংযোগের অব্যবহিত ভাবিফল যদি উৎফুল্লতাজনক, তৃপ্তিপ্রদ, কর্মোৎসাহজনক ও দুশ্চিন্তানাশক না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—উভয় তরফ্ হইতে তাহার সংখ্যা কমানো, নতুবা সহবাসের স্থান-কাল-ভঙ্গী ও তৎসহ জীবনযাত্রার ধারা পরিবর্তনের প্রয়োজন।

ধাতু-প্রকৃতি-স্বাস্থ্যবিশেষে নরের ছত্রিশ হইতে বিয়াল্লিশ বৎসরের পর হইতে প্রৌঢ়ত্বের আরম্ভ। প্রৌঢ়কালে সম্ভোগ সপ্তাহে একবার কমাইয়া আনা উচিত। পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বৎসরের পর হইতে বাঙালী পুরুষের বার্ধক্য সূচিত হয়; পঞ্চাশান্তে অথবা বার্ধক্যের সূত্রপাত হইতে 'মাসে এক বছরে বারো' নীতি অনুসরণের প্রয়াস সকল দিক্ দিয়া মঙ্গলজনক। আমাদের মতে সমস্ত যৌবনকালব্যাপী নিয়মিত স্ত্রীসম্ভোগ স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর তো নহেই—বরং উপকারী। তবে চল্লিশের পর হইতে উহা একটু একটু করিয়া কমাইয়া আনাই সমীচীন। পঞ্চাশ হইতে পঞ্চান্নর পর উভয়ের সাধ ও সাধ্য থাকে তো একেবারে বন্ধ করুন।...'বনং ব্রজেৎ' কথাটার আসল অর্থই হইল নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য পালন করা। এই বয়সের পর স্বামিস্ত্রী পরস্পরের পূর্ণ সম্মতি লইয়া স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে যদি ব্রহ্মচর্য পালন করেন, তাহা হইলে উহা একদিকে বুদ্ধিবৃত্তি, মেধা ও ধৃতিশক্তি যেমন বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে বার্ধক্যজনিত নানারূপ কষ্টকর উপসর্গ ও সামর্থ্যহীনতা বহুপরিমাণে নিবারিত করে।...কিন্তু বহু স্ত্রীলোকেরই প্রায় ৫০ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্পষ্ট তাগিদ থাকে; তাহা মাঝে মাঝে মিটাইবার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়।

সত্যকার আকুমার ব্রহ্মচারীরা সংসারে থাকিয়া কখনো দীর্ঘজীবী অথবা চিরস্বাস্থ্যবান হইতে পারেন না। সমস্ত জগৎ জুড়িয়া এই সত্যটি জাজ্বল্যমান। আমাদের দেশে শঙ্করাচার্য, বিবেকানন্দ, নামেমাত্র কৃতদার চৈতন্যদেব প্রভৃতি দীর্ঘ পরমায়ুর অধিকারী হইতে পারেন নাই। আজকালকার মঠের সন্ন্যাসীদের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন —কাহারো বিরাট ভুঁড়িসমন্বিত মেদোবহুল অকর্মণ্য দেহগম্বুজ, কাহারো সর্বাঙ্গে অকাল জরার মসীময় রেখাবলী! স্বাস্থ্যের সৌম্যদীপ্তি নাই—বাক্যে ও ব্যবহারে উত্তম ও আনন্দের দিব্য হিল্লোল নাই! ইহার প্রধান কারণ দুইটি থাকিতে পারে। হয় তাঁহারা সশঙ্কচিত্তে গোপনে অননুমোদিত প্রণালীতে বা অপরিমিতভাবে কামচর্চা করেন, নচেৎ নিয়তোদিত প্রবল কামাবেগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ক্ষতবিক্ষত, ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন। যদি সংসারের পুরা আওতায় কোন সন্ন্যাসী অটুট স্বাস্থ্যসম্পন্ন, সদা কর্মচঞ্চল, আনন্দময় ও দীর্ঘজীবী রহিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তিনি কায়মনোবাক্যে আযৌবন ব্রহ্মচারী নহেন বলিয়া সন্দেহ করাটা বোধহয় একেবারে অমূলক হইবে না।

কামোপভোগে নিয়মনিষ্ঠা

যে সকল প্রবাসী চাকরিজীবী সাপ্তাহান্তিক অবসরে নিয়মিত দেশে গিয়া স্ত্রীসংসর্গ করিয়া আসেন, তাঁহাদিগের স্বাস্থ্য—যাঁহারা বৎসরে একবার বা দুইবার মাত্র দিন কয়েকের জন্য দেশে যাইবার সুযোগ পান, তাঁহাদের চেয়ে সাধারণত অধিকতর নীরোগ, অভঙ্গুর হয়। প্রবাসী যুবক ও প্রোষিতভর্তৃকা যুবতী পত্নী—উভয়েরই বাধ্যতাজনিত রতিবিরতি শরীরমনের উপর অত্যন্ত অনিষ্টকর ক্রিয়া করে। তদুপরি উভয়েরই ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক অধোগতির কতখানি

সম্ভাবনা থাকে, তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলিবে। নিধুবন-বঞ্চিতা হইয়া অনেক স্ত্রীলোক বহুদিন থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু প্রেমিক স্বামীর সঙ্গসুখ-বিরহিত হইয়া বেশীদিন সুস্থ থাকিতে পারে না। ইহার ফলে বহু রমণীর কষ্টরজঃ, বাধক, প্রদর, হিস্‌টিরিয়া, জরায়ুঘটিত নানা রোগ, হৃদ্‌দৌর্বল্য, অজীর্ণ, শীরঃপীড়া ও রক্তাল্পতা প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়।

রাত্রিকালই স্ত্রী-সম্ভোগের শ্রেষ্ঠ সময় বটে; কিন্তু আহারের অন্তত এক ঘণ্টা পরে সাধন করাই স্বাস্থ্যের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল। কেহ কেহ এক ঘুমের পর সাধন করা সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা বলেন,—ইহাতে একটা চমৎকার পরীক্ষা হয়। কোনদিন সত্যকার আন্তরিক যৌনক্ষুধার উদ্রেক হইলে, একে তো কোন পক্ষেরই সহজে ঘুম আসে না, তদুপরি যদি বা আসে, তাহা হইলে মাঝরাত্রে তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবেই এবং একটা দুরন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হইবেই। মিথ্যা ক্ষুধাবোধে ঘুম আসে সহজে, ভাঙে একেবারে সকালে।

নিশীথ-সহবাসে অসুবিধা থাকিলে মাধ্যাহ্নিক আহারের অন্তত ঘণ্টা দেড়েক পরে চলিতে পারে। মাঘের মাঝামাঝি হইতে চৈত্রের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত অথবা আষাঢ়-শ্রাবণ মাসই এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অনুকূল। তবে যে-কোন সময়েই সংযোগ হউক না কেন, উহার পর যেন পুরা দুই ঘণ্টাকাল নিদ্রা ও বিশ্রামের অবসর থাকে। নচেৎ পুনঃপুনঃ এরূপ আচরণে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।

সহবাস সম্বন্ধে আরো কয়টি তথ্য স্মরণ রাখা কর্তব্য। যথা—

(১) স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মধ্যেই সর্বদেশে, সর্বকালে অধিক বা অল্প বা তন্মধ্য-স্তরের কামুক দেখা যায়। লোকপ্রবাদ, সামাজিক ঐতিহ্য বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বলে বলীয়ান হইয়া কেহ কেহ বলেন, স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা বেশী বা অল্প

কামপ্রবণ। কিন্তু এ বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা না করিয়া, এইটুকু বলিতে চাই যে, পুরুষের ন্যায় সমান আবেষ্টনী ও বহির্জগতের প্রভাবের মধ্যে থাকিলে স্ত্রীলোকের কামলিপ্সা পুরুষের সমান-সমানই জাগে; কাহারো বরং প্রবলতর হইয়া উঠে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বহু ভদ্র স্ত্রীলোকের লিপ্সা নানাবিধ বাহ্য উপচার, চাটুবাদ, বিলাস-বিভ্রম, দৃষ্টিভোগ, ঠাট্টাইয়ার্কি, স্পর্শ অথবা প্রেমপত্র প্রভৃতির দ্বারা নিছক দৈহিকসম্ভোগ ব্যতিরেকেও অপরোক্ষভাবে ও কাল্পনিকভাবে বহুলাংশে মিটিতে পারে; পুরুষের কিন্তু সচরাচর সেরূপভাবে মিটে না, বরং বাড়ে।

(৪) পুরুষের ন্যায় নারীর কামাধিক্য বংশানুসারিতা ও বাহ্য প্রভাবের বশে স্বভাবসংবদ্ধ হয়। বাল্যকাল হইতে যৌবনোন্মেষ পর্যন্ত একাকী বিচরণের স্বাধীনতা, অসম্পর্কিত বা দূরসম্পর্কীয় যুবকদিগের সহিত অবাধ মেলামেশার সুযোগ, আত্মপবিত্রতা ও আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে অস্ফুট ধারণা-পোষণ, সচ্চরিত্র পিতামাতার প্রত্যক্ষ প্রভাব-বিরহিত অবস্থা, কাণ্ডজ্ঞানহীন দাসদাসীর নিয়ত সংসর্গ ও পরিচর্যা-লাভ, দূষিতচরিত্র পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজনের দৃষ্টান্ত প্রভৃতি ভদ্রবংশীয় কন্যাকে কামের প্রতি অসময়ে অথবা অসঙ্গতভাবে সজাগ করিয়া তুলিতে পারে।

(৫) সম্ভোগে নারী পুরুষ অপেক্ষা বেশী আনন্দ পায় সত্য, কিন্তু সেই আনন্দলোকে পৌঁছিতে তাহার সময় লাগে বেশী। বিবাহিতা স্ত্রী—সহবাস-ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বামীর ইচ্ছা ও আবেগের অধীন, রমণ-কালে সে নিথর নিশ্চেষ্ট হইয়া মুখ বুঁজিয়া পড়িয়া থাকিবে, নতুবা চিরদিন আশ্লেষ-সময়ে লজ্জা বা বিরক্তিতে 'না-না' বলিয়া অনিচ্ছা প্রকাশ করিবে, অথবা কোনদিনই কামাবেশের নিদর্শন চোখেমুখে মাখিয়া বিলোল উন্মাদনায় পুরুষের গাত্রে এলাইয়া পড়িবে না···এ পরিজ্ঞান নিতান্ত অজ্ঞতাপ্রসূত। যদি কাহারো স্ত্রী এরূপ শীতল ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন, তাহা হইলে

বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে যথোচিত ভালবাসেন না, নচেৎ তিনি স্ত্রীকে সত্যকার রতিসুখ-দানের অযোগ্য।

(৪) সাধারণত পুরুষের কামেচ্ছা জাগিলেই এবং স্ত্রীকে হাতের কাছে পাইলেই তৎক্ষণাৎ তাহা মিটাইতে প্রবৃত্ত হন,—একবার স্ত্রীর সম্মতি লওয়ারও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। ইহাতে স্ত্রীর আত্মসম্মান আহত তো হয়ই, তদুপরি অনিচ্ছাপ্রসূত আত্মদানে অনেক সময় উভয়েরই অল্পবিস্তর পূর্ণানন্দ উপভোগে ব্যাঘাত ঘটে।···অথচ কত অল্পায়াসে ও সামান্য কৌশলে স্ত্রীকে সম্মত ও কামতপ্ত করিয়া লওয়া যায়!

স্বাভাবিক পুরুষের তৃপ্তি পাইতে যে সময় লাগে, স্বাস্থ্যবতী কামপীড়িতা নারীর তৃপ্তিশিখরে পৌঁছিতে লাগে তদপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ সময়,—মোটামুটি সাত-আট-নয় মিনিট। সুতরাং কামজীবনের আগাগোড়াই পুরুষকে এই কয়টি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক সহবাসের পূর্বে চারি, পাঁচ বা ছয় মিনিট-কাল হস্তবিলেপন (সুড়সুড়ি), অঙ্গমর্দন, চুম্বন, চোষণ, আলিঙ্গন প্রভৃতি দ্বারা রমণীকে রতিক্রিয়ার জন্য পূর্ণজাগ্রত ও ঈষৎ অগ্রসর করিয়া লওয়া চাই। সংসর্গকালে অতিরিক্ত আগ্রহবশত গোড়া হইতে দ্রুত কটি আন্দোলন ও বীর্যপাতের জন্য ব্যগ্রতা সমীচীন নহে। মাঝে মাঝে নিজে নিশ্চেষ্ট হইয়া রমণীকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে অথবা নিজে নিম্নে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে আরোহপ্রণালী অবলম্বন করিতে দেওয়া উচিত। পুরুষের বীর্য-নিষ্কাষণ যথাসাধ্য রমণীর ইতিহর্ষ-প্রাপ্তির সমসাময়িক অথবা পরবর্তী করিতে হয়।*

* যাঁহারা স্ত্রীপুরুষের আসঙ্গলিপ্সার বিকাশ, বিশেষত্ব ও যৌন জীবনের অন্যান্য বৈচিত্র্যের কথা সবিস্তার জানিতে ও তৎসম্বন্ধে নূতন কিছু শিখিতে চাহেন, তাঁহারা গ্রন্থকারের প্রামাণ্য বিরাট পুস্তক 'নরনারীর যৌনবোধ' (৬ষ্ঠ সং) পাঠ করিতে পারেন।

(৫) যাঁহাদের শীঘ্র বীর্যপাত ঘটে, তাঁহারা যদি একটু মনোবল প্রয়োগের অভ্যাস করেন (অর্থাৎ 'বীর্য এক্ষণে কিছুতেই পতিত হইতে দিব না'—এইরূপ একটা ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করেন), রমণকালে কয়েক মিনিট পূর্ব হইতেই দক্ষিণ নাসায় শ্বাস চলাচলের ব্যবস্থা করিতে পারেন, পতনোপক্রমের পূর্ব হইতেই অঙ্গ-আন্দোলনাদি মন্থর করেন ও মাঝে মাঝে কয়েক সেকেণ্ড করিয়া নিশ্চেষ্ট অবস্থান করিতে পারেন, তদুপরি বীর্যপতনাশঙ্কা হইবার সঙ্গে সঙ্গে সজোরে জিহ্বা কামড়াইয়া ধরিতে ও মলদ্বারের মাংসপেশীগুলির (Spincter ani—যে পেশীগুলি মলবেগ রোধ করিতে সাহায্য করে সেগুলির) যথাসাধ্য সংকোচসাধন করিতে পারেন এবং পর পর দুই-তিনটি দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অবশ্যই চরমাবস্থা আসিতে আরো সামান্য কিছু বিলম্ব ঘটিবে।

একই রাত্রিতে দুইবার অথবা উপর্যুপরি দুই রাত্রিতে দুইবার উপগত হইলে স্বভাবত পরবর্তী রতিক্রিয়াটি অধিকতর প্রলম্বিত হইয়া থাকে। ইহাতে মোটামুটি কামভাবযুক্তা নারী সুখী ছাড়া অসুখী হন না।

(৬) সহবাসকালে কিরূপ স্থিতি গ্রহণ করা উচিত, অনেকেরই মনে এই প্রশ্ন জাগে এবং বহু নবীন দম্পতি এ সম্বন্ধে সদুত্তরের জন্য গ্রন্থকারকে পত্র লেখেন। এক কথায় ইহার সদুত্তর দিতে গেলে বলিতে হয় যে, যেরূপ অঙ্গবিন্যাসে উভয় পক্ষই কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করেন না, তাহাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। সাধারণত আমাদের দেশে যুগযুগান্ত ধরিয়া যে মুদ্রা আচরিত হইয়া আসিতেছে, তাহা হইল—স্ত্রীলোকের চিৎ হইয়া নিম্নে অবস্থান ও পুরুষের তদুপরি আলতোভাবে নিম্নমুখী হইয়া শয়ন।

স্ত্রীলোক শয়ন-কালে মাথার নীচে বালিশ রাখিবে না—যাহাতে পৃষ্ঠদেশ ও শিরের পশ্চাদ্ভাগ একই সমতল

ক্ষেত্রে অবস্থান করে। যাহাদের স্বামীর সাধনযন্ত্র ক্ষুদ্র অথবা পুনঃপুনঃ গর্ভধারণের ফলে যাহাদের যোনিনালীর বিস্ফার প্রতীয়মানত বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহারা নিতম্বতলে বড় জোর তিন ইঞ্চি উচ্চ একটা মাঝারি আকারের মাথার বালিশ রক্ষা করিতে পারে। চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া পায়ের হাঁটু দুইটি দ'য়ের আকারে ভাঙিয়া উরুদ্বয় যথা-সম্ভব উভয়দিকে মেলিয়া উদরের দিকে ঈষৎ টানিয়া আনিতে হইবে। এই অবস্থায় পুরুষ তাহার সাধনযন্ত্র নারী-সম্বাধে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া, আপন হাঁটু ও কনুইয়ের উপর দেহভার রক্ষা করিয়া রমণীর দেহ আবৃত করিয়া শুইয়া পড়িবে। ইহার পর নারী তাহার হস্তদ্বয় পুরুষের গলা বা পৃষ্ঠদেশে বিজড়িত করিয়া দিবে, এবং আপন পদদ্বয় পৃষ্ঠের নিম্নপ্রান্তে লতায়িত করিয়া দিতে পারে। সোহাগ ও অঙ্গাদি-আন্দোলন উভয় তরফ্ হইতে চালিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তাহাও বেশ 'বিলম্বিত লয়ে' ছন্দোবদ্ধভাবে হওয়া চাই। সহবাসকালের প্রথম অর্ধভাগে স্ত্রীলোকের আরোহ-প্রণালী এবং শেষার্ধে অবরোহ-প্রণালী অবলম্বন করা সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক ও ন্যায়ত-ধর্মত সমীচীন বলিয়া কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক মত প্রকাশ করিয়াছেন। লেখকও এই মতের সমর্থক।...ইহা ব্যতীত মাঝে মাঝে মুদ্রার রকমফের করা উচিত।

কেহ কেহ স্ত্রীলোককে বিপরীতমুখী করিয়া পশুবৎ স্থিতিতে অথবা উভয়ের উপবিষ্ট ও মুখোমুখী অবস্থায় সংযোগ করা পছন্দ করেন।...দণ্ডায়মান অবস্থায় রমণ পরস্পরের পক্ষে কষ্টকর ও কদাচ অভ্যাস করা উচিত নহে।

(৭) সুস্থ অল্পেতৃপ্ত স্ত্রীলোকের রমণেচ্ছা একরাত্রে পুনঃপুনঃ বা উপর্যুপরি কয়েক রাত্রি জাগিতে দেখা যায় না; কিন্তু সুস্থ সবল যুবক পুরুষের দেখা যায়। স্ত্রীলোকের কামনা-তটিনীতে জোয়ার-ভাঁটা আছে, এ কথা স্বদেশ-বিদেশের লৈঙ্গতত্ত্ববিদ্‌গণ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের ফলে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু পুরুষের এরূপ জোঁয়ার-ভাঁটা খেলে কি না, তাহা বহু আয়াসেও ধরিতে পারা যায় নাই।

স্বাভাবিক অবস্থাপন্ন নারীদের সাধারণত ঋতুস্রাব আরম্ভের অব্যবহিত পূর্বের দুই-একদিন ও পরের দুই-একদিন এবং দুই ঋতুস্রাবের মাঝামাঝি কয়েকদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসঙ্গলিপ্সা জাগরূক হয়। পুরুষের সহবাসের ইচ্ছা ও উদ্যম তাহার লিঙ্গোত্থানের একান্ত মুখোপেক্ষী। একরাত্রে দুই-তিন বার কিংবা প্রতিদিন পর পর কয়েকবার সঙ্গমের ফলে যদি কাহারো সাধনযন্ত্র উপযুক্তভাবে উচ্ছ্রিত না হয়, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কারণ প্রায় ক্ষেত্রেই এই অসামর্থ্য অল্পস্থায়ী। সেই সময় কয়েকদিন স্ত্রীর সহিত পৃথক হইয়া বলিষ্ঠমনে সংযম অভ্যাস করা কর্তব্য।

(৮) রতিলীলায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে উভয়পক্ষেরই তজ্জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। পুরুষ স্ত্রী উভয়েই পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ, সুকোমল শয্যাদ্রব্য ও অঙ্গে কিছু গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিবে। সম্ভব হইলে, ঘরে সুগন্ধি ধূপ পুড়াইবে বা বিছানায় ফুল রাখিবে। গোপন প্রদেশ, বগল, মুখ প্রভৃতি অঙ্গাদি যেন সুপরিচ্ছন্ন ও নির্গন্ধ অবস্থায় থাকে। এইজন্য আমাদের শাস্ত্রকারগণ রমণের পূর্বে দম্পতিকে তাম্বুল সেবন এবং অগুরু-কুঙ্কুম অঙ্গে লেপন করিয়া লইতে অনুজ্ঞা দিয়াছেন।

একবার স্বামিস্ত্রী পরস্পরের নিকট সুপরিচিত হইয়া গেলে এবং উভয়ে একটা অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া গেলেই যে পরস্পরের নিকট কোনরূপ শালীনতা ও শুচিতা রক্ষার আর প্রয়োজন নাই,—এ ধারণা পোষণ করা মূর্খতা। স্বামীর খোঁচা-খোঁচা দাড়ি রাখিবার অভ্যাস বা মুখে স্বাভাবিক দুর্গন্ধের জন্য কোন কোন স্ত্রী অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার অনুরাগী হইয়া, সহবাস ব্যাপারে আজীবন অত্যন্ত উদাসীন বা নিরুৎসাহী থাকিয়া যান্, এরূপ ঘটনা ভারতে ও অপরাপর সভ্যদেশে বিরল নহে। স্বামীর দূষিত নিঃশ্বাস বা নিদ্রাকালে গুরুতর নাসিকাগর্জনের অজুহাতে পাশ্চাত্ত্যভূমে ও

আমেরিকায় কোনো কোনো সূক্ষ্ম-শুচিবোধযুক্তা পত্নী বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুজ্ঞাপ্রার্থিনী হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। মুখে তামাক, বিড়ি, মদ্য, গঞ্জিকা প্রভৃতির গন্ধ ভদ্রবংশীয়া বামার গভীর বিরক্তি ও জুগুপ্সার উদ্রেক করে।...রতিক্রিয়াকালে উভয়পক্ষেরই সর্বপ্রকার বস্ত্র বর্জন করা উচিত। কক্ষ একেবারে অন্ধকার করিয়া ফেলা বহু কারণেই নিরাপদ ও আরামপ্রদ।

[এই সূত্রে বলিয়া যাওয়া ভাল যে, বহু রমণী অতিরিক্ত পান-দোক্তা জর্দা খাওয়ার যে অভ্যাস করেন, তাহা শরীরের পক্ষে বিশেষ অহিতকর। ইহাতে দাঁতের যথেষ্ট ক্ষতি হয় সন্দেহ নাই। তদুপরি অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শুষ্ক কাশি, অজীর্ণ, নিদ্রালুতা, হেঁচ্‌কি, অতিরিক্ত উত্তাপবোধ, হৃদ্দৌর্বল্য, শিরঃপীড়া, পেটের গোলমাল প্রভৃতি বহুবিধ উপসর্গ দেখা দেয়। কোন কোন চিকিৎসাবিশারদ সন্দেহ করেন যে, অতিরিক্ত দোক্তাভোজীরা কয়েক বৎসর পরে পেটের ক্যান্সার, আল্‌সার, ক্ষত, বাধক, কষ্টরজ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া মৃত্যুর পথ সুপ্রশস্ত করে। যাঁহারা এই কদভ্যাস কিছুতেই ছাড়িতে পারেন না, তাঁহারা যেন মাত্র দুইবার প্রধান আহারের পর দুইটি পানের সহিত সামান্য দোক্তা বা জর্দা সেবন করেন। কোনো অবস্থাতেই যেন দোক্তার রস পেটের মধ্যে না যায়, পান বেশীক্ষণ যেন মুখের মধ্যে পুষিয়া রাখা না হয় এবং কিছুক্ষণ পরে—বিশেষভাবে রাত্রিতে—পানের ছিব্‌ড়া ফেলিয়া মুখবিবর যেন পুনঃপুনঃ কুলকুচা করিয়া ধুইয়া ফেলা হয়।]

(৯) স্বামী অথবা স্ত্রী কামার্ত হইলে, প্রতিবার অপর পক্ষের যেন অনুমতি গ্রহণ করেন এবং তাহাকে উদ্রিক্ত করিবার বিধিমতো চেষ্টা করেন। মেয়েদের কাম প্রবুদ্ধ হইতে যেমন বিলম্ব হয়, কামতৃষ্ণা মিটিতে ও উত্তাপ কমিতে তেমনি বিলম্ব হয়। প্রতিবার সহবাসের পর পরস্পর পরস্পরকে যেন জিজ্ঞাসা করেন যে, তদ্দ্বারা তিনি পূর্ণতৃপ্তি লাভ

করিয়াছেন কিনা। সাধারণত মূলক্রিয়া নিষ্পত্তির অব্যবহিত পরেই স্ত্রীপুরুষ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। তাহা না করিয়া, সংলগ্ন অবস্থায় অন্তত মিনিট দেড়-দুই অবস্থান করা ও তৎসহ কিছু মৃদু রকমের আদর-আপ্যায়ন প্রয়োগ করা উচিত।

(১০) প্রতিদিন বা প্রতিবারই স্বামীর অগ্রবর্তী বা উপযাচক হওয়া উচিত নহে; মাঝে মাঝে স্ত্রীকে প্রস্তাব করিতে দেওয়ায় নূতনত্ব আছে।...জলদ্বারা জননযন্ত্রাদি ধৌত করার প্রথাটি আমাদের দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহার বিরুদ্ধে প্রবল চিকিৎসা-বিজ্ঞানিক মত সম্প্রতি মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে। বীর্য ও বিসৃষ্টি-রসের প্রতি একটা বিজাতীয় ঘৃণাভাব পোষণ করা অনেকের যেন মজ্জাগত; অথচ বিষ্ঠা-মূত্র-ঘর্মের ন্যায় ঘৃণা উদ্রেকের উপযুক্ত কোন অনিষ্টকর পদার্থ ইহাদের মধ্যে নাই। রাত্রির মতো কোনরূপ শুষ্ক, অথবা সিক্ত কোমল বস্ত্রখণ্ড বা স্পঞ্জ্ ব্যবহার করা সর্বতোভাবে বিধেয়।...পুরুষের বীর্যের মধ্যে দেহপুষ্টিকর বহু উপাদান বর্তমান।

স্ত্রীলোকের জরায়ু ও যোনিপ্রাচীর-গাত্রে পুরুষের নিষ্কাসিত যে বীর্যটুকু লাগিয়া থাকে, তাহা ধৌত না করিলে উহার সামান্যাংশ রমণীর দেহ-বিধানে সারারাত্র আশোষিত হইয়া কিছু উপকার সাধন করে বলিয়া কোন কোন বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস। সুতরাং বাহ্য প্রদেশ মুছিয়া ভিতরের বস্তু অব্যাহত রাখাই কর্তব্য। পরদিন শৌচকার্য অথবা স্নানের সময় আমূল জননযন্ত্র ধৌত করাই স্বাস্থ্যসম্মত। এতখানি কায়িক চেষ্টা সাধনের পর, শরীরের উত্তাপ স্বাভাবিক অবস্থায় আসিতে না আসিতেই জননযন্ত্রে শীতল জল-প্রয়োগের অভ্যাস পুরুষের অকালে লিঙ্গশৈথিল্য আনিয়া দিতে পারে; বহু স্ত্রীলোকের যোনিনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ, স্পর্শানুভূতির তীক্ষ্ণতা হ্রাস, পেশীকাঠিন্য প্রভৃতি উপস্থিত করিতে পারে, এবং বহু ক্ষেত্রে করেও।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সংসর্গ নিষিদ্ধ

নিম্নলিখিত সময়, অবস্থা ও ক্ষেত্রে স্ত্রীসংসর্গ একেবারে নিষিদ্ধ :—

(১) প্রভাতে ও সন্ধ্যায়; স্নান, আহার, ব্যায়াম ও ভ্রমণের অব্যবহিত পরে।

(২) ঋতু হইবার প্রথম তিন-চারিদিন অথবা যে কয়দিন স্পষ্ট শোণিতনিঃস্রাব হইতে থাকে।

(৩) নিজের অথবা স্ত্রীর কোনরূপ অসুস্থতা-অবস্থায়। গৃহে কোন সংক্রামক ব্যাধি হইলে।

(৪) সিফিলিস্ বা গনোরিয়া হইলে,—সম্পূর্ণ রোগমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত।

(৫) গর্ভের শেষ দুই-তিনমাস। উভয়পক্ষের নিতান্ত ইচ্ছা থাকিলে, পার্শ্বশায়িত অথবা ভেকোপবিষ্টবৎ অবস্থায় (পেটের উপর যথাসাধ্য চাপ না দিয়া) সম্মিলিত হওয়া যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যাঁহারা মৃতবৎসা বা প্রসবকালে অত্যন্ত কষ্ট পান, তাঁহারা গর্ভধারণ-কালের শেষার্ধ আত্মদমন করিয়া চলিলেই মঙ্গল।

(৬) সন্তান প্রসবের পর দুইমাসকাল। গর্ভ নষ্ট হইবার পর একমাসকাল।

(৭) পানোন্মত্ত হইয়া, দণ্ডায়মান অবস্থায়, পশুবাহিত যানারোহণে, বৃক্ষতলে, অশ্ব ও হস্তীপৃষ্ঠে, নৌকায়, খোলা মাঠে, নদীর ঘাটে ও মুক্তিকাশয়নে।

(৮) যাহাদের রক্তপিত্ত, হাঁপানি, মধুমেহ, কটিবাত, গেঁটেবাত, মেদোবহুলতা, হৃদ্দৌর্বল্য, শূলবেদনা, অপস্মার, মৃগী হার্নিয়া, প্রভৃতি স্থায়ী বা দুরারোগ্য ব্যাধি বর্তমান, তাঁহারা যথাসাধ্য সংযমী হইয়া চলিবেন—ইহাই আমাদের অনুরোধ।

সংযমের ক্ষেত্র ও মাত্রা

অন্যান্য রিপুর ন্যায় কামরিপু দমন করিতে পারা একটা মহৎ কৃতিত্ব—একটা বরণীয় গুণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু দমন ব্যাপারটা যেন অতিরিক্ত আকস্মিক, নির্মম ও দ্রুতসাধিত না হয় অথবা তাহার মধ্যে যেন একটা দীর্ঘস্থায়ী নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বের বেদনা নিত্যজাগরূক না থাকে। আত্মীয়স্বজনের উপর রাগে অভিমানে, ধর্মভাবের ক্ষণিক উদ্দীপনায়, গুরুর মনোহারিণী বক্তৃতায় অথবা হঠাৎ জিদের বসে জোর করিয়া বৈরাগ্য-উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া, শেষে সারাজীবন আফ্‌শোষে গুমরিয়া মরা কিছু বুদ্ধিমানের কার্য নহে। এইরূপ না-হইলেই-ভাল-হইত বৈরাগ্যে শরীর মনের যে ক্ষতি হয়, তাহা ব্যভিচারের ক্ষতি অপেক্ষা অনেক সময় গুরুতর হইয়া পড়ে। বিবাহিতের তো বৈরাগ্য অবলম্বন বা ব্রহ্মচর্যপালন করিবার অধিকার নাই, কারণ, এক্ষেত্রে কর্ম শুধু কর্তার ইচ্ছায় সাধিত হইলে চলিবে না, উহা গৃহিণীরও আন্তরিক সহানুভূতি ও অনুমতিসাপেক্ষ।

সংসার, বিরাগী, দীর্ঘপ্রবাসী, ক্লীব ও পরনারীগামীর স্ত্রী প্রায়ক্ষেত্রে আত্মদমনে অকৃতকার্য হইয়া এবং একপ্রকার বাধ্য হইয়াই চরিত্র হারায়—স্মরণ থাকে যেন।

সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সাধু সঙ্গ, উচ্চ চিন্তা, নিরন্তর খেলাধূলা ও ব্যায়ামচর্চা, সাত্বিক আহার, সেবা, দাক্ষিণ্যবৃত্তি, স্নেহভাজনদের সহিত অত্যন্ত মেলামেশা করা প্রভৃতি উপায় অতিরিক্ত কামপ্রবৃত্তি প্রশমন করিতে পারে বটে, কিন্তু একেবারে সমূলে উৎপাটিত করিতে পারে না। সুতরাং দেহকে রক্তশূন্য করিয়া ও মনকে মনোভবশূন্য করিয়া বাঁচিয়া থাকার বাতুলতা যেন কেহ সাধ করিয়া আমন্ত্রণ না করেন।

চতুর্থ প্রকোষ্ঠ—আহার

ভোগীর ভোগতৃষ্ণাবৃদ্ধি ও রোগীর সম্ভোগবাসনা-হ্রাস বহুলাংশে মুখাপেক্ষী আহার্য-নির্বাচনের উপর। বাংলা-দেশে আহারের সুলভ বিলাসিতা শহরে যেরূপ প্রকট, আহারের দৈন্য পল্লীতে সেইরূপ জাজ্বল্যমান।···হিন্দু চায়ের দোকান আর মুসলমানের কাফিখানা, রাস্তায় ফেরিওয়ালাদের নানাপ্রকার মুখরোচক সস্তার খাবার ও মেস্-হোটেলের অস্বাস্থ্যকর খানাপিনা—আমাদের যৌবনোচিত আত্মবিকাশের ঘোর পরিপন্থী। এই সকল স্থলের খাদ্যের ভিতরে কি কি দোষ বর্তমান, তাঁহার বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। এক কথায় জানিয়া রাখুন যে, বাজারের তেলেভাজা ও তথাকথিত ঘিয়েভাজা খাবার, রাস্তায় ফেরিওয়ালার সুলভ আইস্‌ক্রীম সন্দেশ, শোন্‌পাপড়ি, বিস্কুট, ডালমুট-বাদামভাজা, আলুর চপ, পিঁয়াজের বড়া প্রভৃতি, চায়ের দোকানের চপ-কাটলেট-কারি-কোর্মা আর দক্রুপ্রমেহক্লিষ্ট উড়িয়া পাচকের সরিষা-লঙ্কাবাটা-নিষিক্ত মাছের ঝোল্ ও ঝাল্—ঘোর অস্বাস্থ্য ও অকালবার্ধক্যকে আমাদের নিকট হিড্ হিড্ করিয়া টানিয়া আনে।···তদুপরি, যুদ্ধজনিত মুদ্রাস্ফীতির লাঙ্গুলাগ্নি, কালবাজার ও কণ্ট্রোলের কল্যাণে সর্বত্র আহারের দুর্গতি চরম উঠিয়াছে।

রন্ধনের অষ্টবন্ধন ও বিভীষিকা

অনেক গৃহস্থ-বাটীতেই রন্ধন ব্যাপার যেন একটা দৈনন্দিন বিরাট যজ্ঞ বিশেষ। রক্ষণশীল গৃহস্থবাটীর সমস্ত মেয়েরা সকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত কেবল আহার্য-প্রস্তুতি, ভোজন ও পরিবেশন ব্যাপার লইয়াই ব্যস্ত। ইতিহাস একটা কিংবদন্তীতে বিশ্বাস করে যে, রোম যখন পুড়িতেছিল, সম্রাট নেরো তখন বেহালা-বাদনে মশগুল হইয়া ছিলেন। আমাদের

সংসারে কতকটা এই ধরণের ট্রাজি-কমেডি নিত্য অভিনীত হইতেছে। বিংশ শতকের রন্ধননিমগ্না গৃহিণী তাঁহার পাকশালায় বসিয়া যখন খুন্তি নাড়েন, তখন বিশ্বসংসার যদি ছারখার হইয়া যায়, তাহা হইলে সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি দিবার অবসর থাকে না।...রাঁধিতে রাঁধিতেই বোধ হয় তাঁহাদের জীবনের দশ আনা ভাগ কাটিয়া যায়। তাহার ফলে তাঁহাদের কোন কোন দিন শুধু নিজের চুল বাঁধিতেই ভুল হয় না—স্বামিপুত্রগণের অন্যবিধ সেবাযত্নে এবং সংসারের আরো শত প্রয়োজনীয় ব্যাপারে যথেষ্ট ত্রুটি ও ব্যাঘাত জন্মে।...

এই তো গেল সেকেলে ধরণের এক শ্রেণীর মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী-গৃহের কথা। তারপর আর এক নব্যতান্ত্রিক গৃহস্থ শ্রেণী গজাইয়া উঠিয়াছেন—বড় লোকের কথাই নাই, যাহাদের গৃহিণীর দুই-একটা সন্তান প্রসব করিয়াই জীবনের যত পূজা সারা করিয়া ফেলেন। শহরের ফ্ল্যাটে একার সংসার,—জা-ননদ-শ্বশ্রূকুল দূরপল্লীতে অন্তরায়িতা বা স্বেচ্ছানির্বাসিতা। স্বামী হাট-কোট-প্যাণ্ট আঁটিয়া আফিসে যান। রন্ধনশালার দ্বারদেশে নাসিকাগ্র প্রবেশ করাইলেই ইহাদের মাথা ঘুরিয়া যায়—গাত্র পাকাইয়া উঠে; একদিন আগুনের আঁচে গিয়া তাঁহারা দশদিন শয্যাশায়িনী হন্। তাম্বূলরাগরঞ্জিত, টিকি-পৈতাশোভিত কটক-যাজপুর-বাসী তথাকথিত ঠাকুর তাঁহাদের পাক্-পারাবারের হুঁশিয়ার কাণ্ডারী, সুতরাং অনিবার্য ও নিত্যপূজ্য। সে নয়ন মুদিয়া গরম জলে তেল-হলুদ-তেলাপোকা, রক্তিম থুথুর ছিটা ও দল্‌দা-গরমমশলা মিশাইয়া যে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিবে, তাহাই স্বামিস্ত্রীপুত্রকন্যার নিকট দেবদুর্লভ অমৃতরূপে গ্রাহ্য ও ভোজ্য।

চাকরের উপর বাজারহাট, পাচকের উপর রন্ধন, ঝিয়ের উপর সন্তানপালন এবং প্রাইভেট টিউটরের হাতে বংশধরের মনুষ্যত্ব-গঠনের ভার ছাড়িয়া দিয়া শহরের ঈষৎ অবস্থাপন্ন চাকুরিয়া বাবুরা নিশ্চিন্তে কাল কাটান।

সকাল-বৈকাল-সন্ধ্যায় তাঁহারা অবসর সময়টুকু চা-পান, খবরের কাগজ-চর্বণ, পলিটিক্স্-চর্চা, ক্লাব-মজ্‌লিস, ঘোড়দৌড়, মাছধরা, থিয়েটার, ফুটবল, ক্রিকেট, সিনেমার পশ্চাতে আবাধে নিয়োগ করেন। আর তাঁহাদের গৃহিণীগণ ট্রাম, বাস, রিক্সা (অথবা পয়সাওয়ালা-ঘরের ঘরনিরা বাড়ির মোটরে) চড়িয়া লেক্, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্ ও ইডেন গার্ডেনে হাওয়া খান, সঙ্গীত-সম্মেলন, মহিলা-সঙ্ঘ প্রভৃতিতে যোগ দেন্। নচেৎ ততদূর না গেলেও আত্মীয়-স্বজন-বান্ধবীর বাটীতে গিয়া হাল্‌ফ্যাশানের কানবালা, চুড়ি, আর্মলেট, রতনচূড়, কৃষ্ণচূড়া ও মাদুরা-মাইসোর-মাড়োয়াড়ী শাড়ি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। নতুবা নাটক পড়েন ও অভিনয় দেখেন, রেডিও শোনেন, আধুনিক উপন্যাসের প্রতি পৃষ্ঠার সবটুকু রস নিঃশেষে নিঙড়াইয়া লন এবং সর্বোপরি কোন বাংলা ও হিন্দী বাণীচিত্রকেই আপনার সহৃদয় নিরীক্ষণ হইতে বঞ্চিত করেন না।...

ঘরে রোগের ঔষধ-পথ্য নাই, পুষ্টিকর আহার্যের সংস্থান নাই; অথচ ক্রীম, পমেটম, লিপষ্টিক, লোসন, সাবান, মূল্যবান শাড়ি ও লোক-দেখানো বিলাসিতার বহ্বাড়ম্বর কমে না! একটানা আলস্য, সংযমহীন স্বাধীনতা, চটকদার বিলাসিতা, কর্মবিমুখতা, নীতিমেরুদণ্ডহীন বিদ্যাশিক্ষা, খাদ্যের অবিচার, রন্ধনের অত্যাচার, জীবনযাত্রার ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাপ্রসূত অজস্র কৃত্রিমতা...শুধু আমাদিগের অস্বাস্থ্যকেই ডাকিয়া আনিতেছে না, তদ্র পরিবারের মধ্যে ক্রমশ নানারূপ অশান্তি, অভাব, ভেদবুদ্ধি, ঈর্ষা, ব্যভিচার ও লজ্জাজনক ব্যাধির সৃষ্টি করিতেছে।...

খাদ্যের উপাদান ও কার্যকারিতা

যাহা হউক, এখন খাদ্য সম্বন্ধে কয়েকটি শাদা ও সিধা কথা বলি। আপনারা বোধ হয় অনেকেই জানেন যে,

পৃথিবীর যাবতীয় খাদ্যের প্রত্যেকটির মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়প্রকার উপাদানের দুইটি বা ততোধিক উপাদান বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় :—

(১) **আমিষজাতীয় উপাদান** (প্রোটীন)
(২) **স্নেহজাতীয় উপাদান** (ক্যার্ট্ বা হাইড্রোকার্বন)
(৩) **শালিজাতীয় উপাদান** (কার্বো-হাইড্রেট্)
(৪) **লবণ জাতীয় উপাদান** (সল্ট্স)
(৫) **প্রাণিমা বা খাদ্যপ্রাণ** (ভাইটামিন)
(৬) জল

মৎস্য, মাংস, ডিম, ছানা প্রভৃতি আমিষপ্রধান বা নেত্রজনাত্মক (Nitrogenous) খাদ্য। দাল ও দুগ্ধের মধ্যে আমিষজাতীয় পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকে। আমিষজাতীয় খাদ্যের অভাব হইলে, পেশীসমূহ দুর্বল ও শীর্ণ হইয়া পড়ে, অস্থিসকল সুগঠিত হয় না এবং শারীরাভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলি অতিরিক্ত পরিশ্রমে অপটু হইয়া পড়ে।

সর্বপ্রকার, তৈল, ঘি, মাখন, চর্বি প্রভৃতি স্নেহজাতীয় খাদ্য। দুধের মধ্যেও স্নেহজাতীয় খাদ্যের অভাব নাই। স্নেহ আমাদের দেহে প্রচুর তাপ ও তেজ দান করে। শীতপ্রধান দেশে নিয়ত ও গ্রীষ্মমণ্ডলে শীতঋতুতে স্নেহজাতীয় খাদ্যের অধিক প্রয়োজন হয়। স্নেহবহুল সামগ্রী অধিক পরিমাণে গ্রহণ ও তদনুপাতে পরিশ্রম না করিলে উহার কিয়দংশ মলের সহিত বাহির হইয়া যায় এবং কিয়দংশ মেদরূপে মাংসপেশীর উপর নিরর্থক জমিয়া দেহকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে। অবশ্য পরিমিত মাত্রায় মেদ স্ত্রীপুরুষ সকলের দেহেই সঞ্চিত আছে। তবে বয়স্ক লোক অপেক্ষা শিশুতে—পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের শরীরে মাংসের অনুপাতে মেদ স্বভাবতই একটু বেশী মাত্রায় থাকে।

শালি (অর্থাৎ শ্বেতসার ও শর্করা)-প্রধান খাদ্যও আমাদের দেহে তাপ ও তেজ দান করে—স্ফূর্তি ও উদ্যম আনে ; অথচ ইহা স্নেহ ও আমিষজাতীয় খাদ্য হইতে শীঘ্র পরিপাক পায়। চাউল, আটা, ময়দা, সুজি, ভুট্টা, আলু, বব, গম, সাগু, বার্লি, এরোরুট, ওল, মানকচু, কাঁচকলা, কাঁঠাল-বীজ—শালিপ্রধান খাদ্যের দৃষ্টান্তস্থল। দালের মধ্যে কিছু কমবেশী শতকরা ২৪-২৫ ভাগ আমিষ ও শতকরা ৫০ হইতে ৬০ ভাগ শালিজাতীয় উপাদান থাকে। গুড়, চিনি, মিশ্রি, মধু, কিশ্মিশ্ ও মিষ্টফলের রসে যথেষ্ট পরিমাণে শালি অর্থাৎ শর্করাজাতীয় উপাদান থাকে। দুগ্ধের মধ্যেও অন্যান্য উপাদানের সহিত শর্করার পরিমাণ কিছু কম নহে।

দেহের রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জা-গঠনে নানাজাতীয় লবণের প্রয়োজন। সর্ববিধ তরি-তরকারি ও শাকসব্জির মধ্যে প্রায় সকলপ্রকার লবণই স্বাভাবিকভাবে অবস্থান করে। দুগ্ধ, ডিম, মৎস্য, মাংস ও দালের মধ্যেও যৎসামান্য লাবণিক উপাদান বর্তমান। শাকসব্জিতে আমাদের রক্ত সমৃদ্ধ করে, কোষ্ঠ সাফ রাখে। রন্ধনে ব্যবহৃত লবণ হইল সোডিয়াম-ঘটিত (sodium chloride)।

দুগ্ধে জল তো প্রচুর পরিমাণে আছেই, তাহা ছাড়া মাঠে-চরা সুস্থ গরু, ছাগল, মহিষ, গাধা প্রভৃতি জন্তুর টাট্কা দুগ্ধে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাণিমা বা খাদ্যপ্রাণ থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু উহা যত বেশী জ্বাল দেওয়া যায়, তত বেশী উহার খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হইয়া যায়। যাহা হউক, দেখা গিয়াছে দুগ্ধ সকল জাতীয় খাদ্যোপাদানের আধার ; তাই উহার নাম 'সম্পূর্ণ খাদ্য' (complete food)।

প্রধান তিন প্রকার (ক খ এবং গ শ্রেণীর) প্রাণিমা আছে। আমাদের আদর্শ খাদ্যের মধ্যে তিন প্রকার

প্রাণিমা পর্যাপ্ত থাকা চাই। নচেৎ শরীর ক্রমশ নিস্তেজ রোগ প্রবণ হইয়া পড়ে, অস্থিগুলি মোটা হয় না; হজমশক্তি, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ভালরূপে চলে না; নানাপ্রকার চক্ষের অসুখ, সর্দিকাশি, বেরিবেরি, ক্ষতরোগ প্রভৃতি জন্মিতে পারে। কমলালেবু, বিলাতী বেগুন, গোঁড়া লেবু, ডিমের কুসুম, বাঁধা কপি, পালম্‌শাক, মাখন, যাঁতাভাঙা আটা, ঢেঁকি-ছাটা আমাজা চাল, ভুট্টা, কাঁচা মুগের দাল, বরবটী, অঙ্কুরিত ছোলা, ও নারিকেলের শাঁস, মূলা, ইক্ষু, কড়াই-শুটি, কচি শশা, নূতন পিঁয়াজ, কলা প্রভৃতির মধ্যে একাধিক প্রকার প্রাণিমা যথেষ্ট পাওয়া যায়। রন্ধনের সময় অধিক উত্তাপ পাইয়া প্রায় সকলপ্রকার প্রাণিমাই নষ্ট হইয়া যায়, নচেৎ তৈল বা জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়।

আমাদের খাদ্য কিরূপ হওয়া উচিত

এখন বাঙালীর খাদ্য সম্বন্ধে কয়েকটি উপদেশ দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করি। প্রথমত, বলিতে চাই যে, যে অন্ন আমাদের প্রধান খাদ্য, তাহা নির্বাচন ও রন্ধনের দোষে আমাদের স্বাস্থ্য মাটি হইতে বসিয়াছে। কষ্ট্রোলের চাল যতই নির্গুণ হউক, তাহা ক্রয় করিতেই হইবে। আতপ অপেক্ষা সিদ্ধ চালে, বহুদিনের পুরাতন অপেক্ষা মাস-ছয়েক বা জোর বছর খানেকের পুরাতন চালে পুষ্টিকারিতা-গুণ অধিক। চাউলের এক কোণে ও সারাগায়ের উপরে সূক্ষ্ম লোহিভাত যে আবরণটিতে প্রাণিমাবহুল ও জীবনপোষক বস্তু থাকে, তাহা মিলে ছাঁটাই হওয়ায় ও অতিরিক্ত মাজাঘষায় একেবারে উঠিয়া যায়। তদুপরি, যদি-বা ঢেঁকিছাটা, আকাঁড়া অথবা আমাজা চাল ব্যবহার করা গেল, তথাপি রন্ধন-কালে ফেন্ গালিয়া ফেলিয়া খাদ্যপ্রাণের সবটুকু বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। যাঁহারা শক্তি ও স্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে চাহেন, তাঁহাদের সম্ভব হইলে ঢেঁকিছাঁটা চাল ব্যবহার করা উচিত। হাঁড়িতে আন্দাজমতো ততটুকু জলই চাপাইয়া দিতে হয়—যতটুকুর দ্বারা

ভাত তৈয়ারি হইয়া যায়, অথচ ফেন অবশিষ্ট না থাকে। জানেন্ তো ফেন্‌মিশ্রিত ভাত খাইয়াই উদ্ধত জাপান ইউরো-আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীদিগকে চারি বৎসর কাল নাকানিচুবানি খাওয়াইয়াছিল!

দুবেলা ভাত না খাইয়া, একবেলা অন্তত যাঁতা-ভাঙা আটার মোটা গরম রুটি (ঘি মাখাইয়া) খাওয়ার অভ্যাস অথবা দুই বেলাই ভাতের সহিত দুই-তিন-চারিখানি করিয়া আটার রুটি খাওয়ার অভ্যাস ভালো। সাদা ময়দার মধ্যে পুষ্টিকারিতা-গুণ অত্যন্ত অল্প, তাহা ছাড়া উহার মধ্যে নানা রকমের দুষ্পাচ্য অখাদ্য জিনিসের ভেজাল চলে। বাঙালি জাতিগতভাবে যদি একবেলা ভাত, একবেলা রুটি খাওয়া অভ্যাস করে এবং প্রত্যহ কিছু সিদ্ধ সব্জি ও টাট্‌কা ফলমূল খাইতে পারে, তাহা হইলে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে নিশ্চয় আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্য ও শ্রী অন্যরূপ হইয়া যাইবে। এতকাল ফুরফুরে বালাম, কর্দর্য বাজারের খাবার এবং মার্কা-মারা টিনের ঘৃতে-ভাজা ফুলকো লুচিই ধনী বাঙ্গালীর পরমায়ুর আকাশে উল্কাপাত ঘটাইতেছিল; বর্তমানে বস্তা-পচা কংকরযুক্ত রেশনের চাউল, বালুকাবল্লভ দুর্লভ আটা-ময়দা ও বাদাম-তিষি-তুলাবীজের তৈল ছয় কোটি বাঙালীর সর্বনাশ সাধন করিতেছে।

মূলা, কাঁচা মটর ও কড়াইশুঁটি, পিঁয়াজ, বিলাতী বেগুন, শাকআলু, কমলালেবু, শশা, ফুটি, আঙ্ প্রভৃতি ফল জলযোগ হিসাবে প্রত্যহ কিছু খাওয়া অত্যন্ত সমীচীন। পশ্চিমে ক্ষেত্রী ও এখানকার সুবর্ণবণিকদের অনেকের বাটীতেই দেখিয়াছি, প্রত্যহ প্রধান আহারের সঙ্গে অথবা অব্যবহিত পূর্বে কয়েকপ্রকার টাটকা ফলমূল খাওয়ার রেওয়াজ আছে। নিটোল স্বাস্থ্য ও নিখুঁত সৌন্দর্যে এখনো বোধ করি সম্প্রদায়গতভাবে ইহারা হিন্দুসমাজে অগ্রণী।… ভাজাভুজি অপেক্ষা সিদ্ধ ও ভাতে-পোড়ার পরিমাণও আমাদের দৈনিক খাদ্যে বেশী করিয়া সংযোজিত হওয়া প্রয়োজন

বাঙালীর খাদ্যে আমিষজাতীয় উপাদান স্বভাবতই অল্প। উহার পরিমাণ আর কিছু বাড়াইয়া দেওয়া উচিত। বড়মাছ, মাংস, কাঁকড়া ও ডিমে কামভাব কিছু বাড়ায় বটে, কিন্তু উহাতে পেশীসমূহ সুপুষ্ট ও সুস্পষ্ট হয়—অগ্রবর্তিতা ও সাহস রীতিমতো বৃদ্ধি পায়। পাকা মাছ, মাংস প্রভৃতিতে সাধারণত রসুন, হিং, ঘি, জাফ্রান্, গরমমশলা প্রভৃতি মিশাইয়া আরো উত্তেজক ও দুষ্পাচ্য করিয়া তোলা হয়। প্রতি যুবকযুবতীর জন্য প্রত্যহ আধপোয়া হিসাবে মৎস্য প্রয়োজন হেমন্ত ও শীতকালে সপ্তাহে অন্তত একবার এবং অন্য ঋতুতে মাসে দুইবার মাংস খাওয়া উচিত। প্রত্যহ একটি বা দুইটি করিয়া অর্ধসিদ্ধ মুরগী বা হাসের ডিম হেমন্ত, শীত ও বসন্ত কালের প্রথম ভাগ অবধি হজম করা কিছু কঠিন ব্যাপার নহে; যুবাবস্থায় উহার ব্যবহার কল্যাণকর। অবশ্য এগুলি এখন দুর্মূল্য। অবস্থায় কুলাইলে, প্রত্যহ একপোয়া হইতে অর্ধসের করিয়া দুগ্ধ খাইতে পারেন। নচেৎ পাতলা দধি বা ঘোল খাওয়া প্রশস্ত।

একদিকে দুগ্ধ, ননী, মাখন, অন্যদিকে গাজর, বীট্, টমেটো, আঙুর, আখরোট্, পিঁয়াজ ও কমলালেবু—এইগুলি লাবণ্যজনক খাদ্য। অথচ এইগুলির প্রতি আমাদের দেশের নারীদের স্পষ্ট বিরাগ বর্তমান। বার্মুডা দ্বীপের রমণীরা নাকি জনে-জনে নিখুঁত সুন্দরী। তারপরই জগতের সৌন্দর্য-সভায় কর্সিকা, সার্ডিনিআ, দক্ষিণ ইতালী, গ্রীসীয় দ্বীপপুঞ্জ, পূর্ব-স্পেনীয়, আর্মেনিয়ান্, পশ্চিম তুর্ক, দক্ষিণপূর্ব পারসীক্ ও কাশ্মীরী নারীদিগের স্থান। ইহারা সকলেই পিঁয়াজ, বাদাম, জলপাই ও আঙুর নিত্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে। রাঁধা পিঁয়াজ অপেক্ষা সিদ্ধ-করা, ঝল্‌সানো অথবা টাট্‌কা কাঁচা পিঁয়াজ খাওয়া বেশী ফলদায়ক।

যাহারা মাছ-মাংস খায় না, তাহাদের প্রচুর দাল ও ছানা খাওয়া উচিত। কিন্তু আসিদ্ধ বা 'জলবত্তরলম' দালে

কোন উপকারই নাই। জলখাবার হিসাবে, ঋতু ও রুচি বিশেষে কাঁচামুগের দালভিজানো ও তৎসহিত কিছু গুড়, ছোলা-ভিজা* ও আদা, লাল আটার পাউরুটি (brown bread) ও মাখন, মুড়ি-নারিকেলকোরা ও বাতাসা, ছোলা-সিদ্ধ, কড়াইশুটি, সিদ্ধ, ভিজা চিড়া ও দধি, বাদাম-ভাজা, ছোলাভাজা, মোহনভোগ, সুজির পায়স প্রভৃতি অনুমোদন করা যায়। চা-বর্জন করিয়া, শীতকালে কোকো খাওয়া চলিতে পারে। অন্তসময় এককাপ্ লবণ-লেবুমিশ্রিত গরম জল অথবা দুধ অথবা কোনরূপ উচ্চ শ্রেণীর পেটেন্ট্ 'ফুড্'।

আর একটা কথা। সকালে ভাতের পাতে প্রথমে একটু খাঁটি ঘি (কিংবা মাখন) ও শেষে একটু দধি (বিশেষভাবে বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে) খাওয়া নতুবা খাওয়ার কিছুক্ষণ পরে নিত্য পোয়াটাক্ ঘোল খাওয়া হিতকর। ডাঃ মেচিনিকফ্ একসময় ঘোলের বার্ধক্যনাশী গুণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। বুলগেরিয়ান্‌রা একমাত্র ঘোল খাইয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী ও স্বাস্থ্যবান।...কিন্তু বর্তমানে খাঁটি দুধ-ঘি এদেশে আকাশকুসুম হইয়াছে।

জল অতি সামান্য পরিমাণেও প্রত্যেক খাদ্যের মধ্যে বর্তমান। এমন কি, শুষ্ক আখ্‌রোট্, দাল, মুড়ি, বাদাম-পেস্তার ভিতরেও উহার অভাব নাই।...খাওয়ার সময় জলপান করা মোটেই উচিত নহে; উহার অব্যবহিত পূর্বে দুই-এক ঢোক্ ও পরে দুই-তিন ঢোক্ মাত্র পান করা চলিতে পারে। আহারের দেড় ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা পরে পুরা এক গ্লাস জল পান করা সর্বতোভাবে বিধেয়। রাত্রে শয়নের ঠিক পূর্বে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল ও সকালে উঠিয়াই বাসি-

* ছোলা একদিন জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন জল ফেলিয়া ভিজা-ভিজা অবস্থায় রাখিয়া দিলেই পরদিন ঈষৎ অঙ্কুরোদ্গম হয়। সেই ছোলাই প্রাণিমাবহুল ও গ্রহণের সর্বাধিক উপযোগী। এইভাবে অঙ্কুরিত কাঁচা মুগ অধিকতর প্রাণিমাপূর্ণ।

পেটে ঈষৎ লবণ ও লেবুরস-মিশ্রিত একগ্লাস কবোষ্ণ জল খাইলে, বিশেষভাবে অম্লপ্রপীড়িত ব্যক্তির প্রভূত উপকার সাধিত হয়। তাহা ছাড়া, ইহার দ্বারা কর্মে উৎসাহ, আহারে রুচি ও মনে প্রফুল্লতা আসে। সর্বঋতুতেই প্রত্যহ দুই হইতে আড়াই সের জল পান করা ভাল।

পানাহারের অষ্টনীতি

আহার সম্বন্ধে এই নীতিগুলি পালন করিলে যৌবনের কমনীয়তা ও স্ফূর্তি সুন্দরভাবে বজায় থাকিবে :—

(১) রাগের মাথায় থাকিবার সময়, অথবা পরিশ্রমের কাজ করিয়া আসিয়া, তৎক্ষণাৎ কদাচ আহারে বসিবেন না। আহারের সময় বেশী কথাবার্তা কহিবেন না, অথবা হাসাহাসি করিবেন না।

(২) ভাত খুব ঝোলা-ঝোলা করিয়া ব্যঞ্জন বা দাল দিয়া মাখা উচিত নহে। খাদ্যদ্রব্য আস্তে আস্তে চিবাইয়া লালা-মিশ্রিত করিয়া খাইবেন। ভাত, রুটি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য মুখের মধ্যে আংশিকভাবে পরিপাক পায় এবং যতখানি লালা মিশ্রিত হয়, ঠিক তদনুপাতে পেটের মধ্যে গিয়া হজম হয় ও শরীরের পুষ্টি যোগায়।

(৩) রেল্-স্টীমারে ভ্রমণ-কালে কখনো স্টেশন বা স্টীমার-ভেণ্ডরের তেলে-ঘিয়ে-ভাজা খাবার, রুটি-বিস্কুট প্রভৃতি কৌটায় রক্ষিত খাবার, জেলি, চাটনি প্রভৃতি, এবং নিজ বাড়িতে অত্যধিক লঙ্কার-ঝাল, বাসি ভাত-রুটি-লুচি, পচা মাছ প্রভৃতি ভুলিয়াও মুখে তুলিবেন না—তাহাতে কিছুক্ষণ উপবাস-কষ্ট সহিতে হয়, তা-ও ভালো।

(৪) প্রত্যহই খাবার জিনিসের সাধ্যমত রকমারি করা ভালো। নিত্য একই স্থানে বসিয়া একই লোকের

রাঁধা একই প্রকারের দাল-তরকারি মাছ খাইতে খাইতে অরুচি ধরা অসম্ভব নহে। এইজন্য মাঝে মাঝে বাগান-ভোজন, চড়ুই-ভাতি, বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ-রক্ষা প্রভৃতি বেশ আনন্দদায়ক।

(৫) বাজি ফেলিয়া কখনো খাওয়া উচিত নহে। নিমন্ত্রণ-রক্ষণ ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত ভোজন যথাসাধ্য এড়াইয়া চলা উচিত। [কয়েক বৎসর ধরিয়া অতিথি-নিয়ন্ত্রণ আইন, কণ্ট্রোল, কালাবাজার ও মহার্ঘতার কল্যাণে নিমন্ত্রণ ও ভূরিভোজন দুই-ই আজকাল দুর্লভ। সুতরাং এ নিয়মটী আপাতত প্রায় অকেজো হইয়া থাকিবে।]

(৬) দিবসে আহারের পর অন্তত আধ ঘণ্টাটাক্ বিশ্রাম লইতে হয়। রাত্রিতে আহারের অন্তত একঘণ্টা পরে শয়ন করা বিধেয়। পণ্ডিত ভাবমিশ্র বড় খাঁটি কথা বলিয়া গিয়াছেন—'আয়ুশ্চক্রমমানস্য ধাবতঃ' অর্থাৎ আহার করিয়াই যে দৌড়ায়, মৃত্যুও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ায়।

(৭) আহারে সময়-ও-নিয়মনিষ্ঠা চিরকাল পালন করিয়া চলিলে, অনেক অসুখের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন। রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন—ঠিক যে সময়টিতেই খাওয়া অভ্যাস, সেই সময়টিতেই খাইবেন, দেরি করিবেন না। [কিছুদিন আগে পর্যন্ত দেখিয়াছি বহু কাণ্ডজ্ঞানহীন বাঙ্গালির নিমন্ত্রণ-বাড়িতে বেলা দ্বিপ্রহর অথবা মধ্যরাত্রি অতীত না হইলে পাত পাতা হইত না। সুতরাং কেহ কেহ 'পিত্তি মেরে ভোজনের' প্রত্যাশায় না থাকিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া নতুবা কোন মিথ্যা অছিলায় একটু দই-সন্দেশ খাইয়াই সরিয়া পড়িতেন।]

(৮) মাসে অন্তত একবার জোলাপ লইবেন। অথবা লবণ-মিশ্রিত সাবান-গোলা ঈষদুষ্ণ জলের ডুশ লইয়া অন্ত্র ধৌত করিয়া ফেলিবেন।…যুবকযুবতীর পক্ষে মাসে একদিন, প্রৌঢ়প্রৌঢ়ার পক্ষে মাসে দুইদিন, বৃদ্ধবৃদ্ধার পক্ষে

সপ্তাহে একদিন পূর্ণ উপবাস দেওয়া অত্যন্ত হিতকর। যাহাদের বাত, বদহজম, মেদবৃদ্ধি, কৃমি, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য, হাঁপানি, নিত্য মাথা-ধরা প্রভৃতি রোগ আছে, তাঁহারা চিকিৎসকের উপদেশ লইয়া প্রতি বৎসর একাদিক্রমে পাঁচ-সাত দিন উপবাস করিয়া দেখিতে পারেন। প্রথম দুই দিন একটু চন্‌চনে ক্ষুধাবোধ ও কষ্ট হয়, তারপর শরীর লঘু স্বচ্ছন্দ মনে হয়। উপবাস-কালে শুধু লবণ ও লেবুর রস-মিশ্রিত জল বা পাতলা ঘোল দুই-চারি কাপ খাওয়া যায়। উপবাস-ভঙ্গের দিন কেবল ২।৩টী কমলালেবু ও পোয়া দেড়েক দুধ খাইতে এবং লঘুপথ্য করিতে হয়।…

সকলেই মাঝে-মাঝে বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, পাকযন্ত্রও কি করে না?

পঞ্চম প্রকোষ্ঠ—ব্যায়াম ও বিশ্রাম

ব্যায়ামের উপকারিতা কতখানি, তাহা বাঙালি যুবকমাত্রেই অল্পবিস্তর জানেন; সুতরাং সে সম্বন্ধে লম্বা উপদেশ লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন দেখি না। তবে বাঙ্‌লার যুব-শক্তি যে কিশোরকাল হইতে উপযুক্ত ব্যায়ামচর্চার অভাবে উৎসন্নের পথে যাইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শক্তি যাহার আছে, তাহার নিকাট অস্বাস্থ্য আসে না, শত্রু তাহার শতহস্ত দূর দিয়া সসম্ভ্রমে চলে। শক্তির অভাবে আমাদের জাতীয় জীবনে কি কি দুর্গতি আসিয়াছে, তাহার বিস্তৃত ফিরিস্তি দিবার এখানে স্থানাভাব। কিন্তু শক্তি-অনুশীলনের দ্বারা যে আমরা নিজেদের স্বাস্থ্যকে

উন্নত ও যৌবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারি, সে বিষয়ে বোধ করি কাহারো সহিত মতভেদ হইবে না। অথচ ব্যায়ামের নাম শুনিয়া গড়পড়তা বাঙালি যুবক বলে, 'উহাতে লেখাপড়া ও কাজকর্মের ভীষণ ক্ষতি,' 'শরীর চোয়াড়ে ও লালিত্যহীন হয়,' 'প্রচুর ঘি-মাংস-বাদাম-পেস্তা খাইতে হয়—পাইব কোথায়?' 'গ্রিপ-ডাম্বেল, মুগুর, চেস্ট্-এক্সপ্যাণ্ডার প্রভৃতি কেনার পয়সা নাই,' 'ব্যায়াম করিয়া ছাড়িয়া দিলে বুড়ো বয়সে বাত, প্রস্রাবের ব্যায়রাম, পক্ষাঘাত হয়'…ইত্যাদি।…এগুলি কিন্তু অলস ও আয়েসী জীবের মনগড়া মিথ্যা অজুহাত!

ব্যায়ামের সঙ্গে দামী আহারের সম্বন্ধ

ব্যায়াম করিলেই যে নিত্য ভূরি ভূরি বাদাম-পেস্তা-আখরোট ও মাংস-ডিম খাইতে হইবে—এমন কিছু কথা নাই। ব্যায়াম ছাড়িয়া আহারে বিলাসিতা শেষ পর্যন্ত সমানে বজায় রাখিতে গেলেই বাত, প্রস্রাবের ব্যায়রাম প্রভৃতি আসিতে পারে।…ব্যায়ামে বেশ-কিছু ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়, সেই ক্ষুধা সময়মতো ভাত-দাল-শাক-চচ্চড়ি-মাছের দ্বারা মিটাইলে যথেষ্ট পুষ্টি ঘটে। চাকুরিজীবী প্রবাসী হিন্দুস্থানীরা দুবেলা মোটামোটা কয়েকখানা আটার রুটী, একটু অড়হর দাল, দু'একটা মূলা, পিঁয়াজ বা ঢ্যাঁড়সের চর্চড়ি খায়। দেশ হইতে মাঝে মাঝে দুই-এক সের ঘি আনায়, তাহারই বৎসামান্য হয়ত রুটীতে মাখায়—ছিটে-ফোঁটা দালে দেয়। মাঝে মাঝে সুবিধা হইলে; ভুট্টা পোড়াইয়া খায়, কড়াইশুঁটির ঘুঘ্‌নি খায়, কাঁচা মূলা—কাঁচা শাঁকআলু খায়, ইক্ষু চিবায়। একটু পয়সার সাচ্ছল্য থাকিলে, রাত্রে একভাঁড় গরম দুধ কিনিয়া, একটু চিনি মিশাইয়া তরিবৎ করিয়া পান করে। শ্রমিকরা দুপুর বেলা ব্রেক্ ছাতু খায়। তাহাদের স্বাস্থ্য ও

শক্তি বাঙালি বাবুদের চেয়ে অনেক ভালো। তাহাদের দৃঢ় মাংসপেশী আমাদের বিশীর্ণ দেহযষ্টির দিকে চাহিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসে। তাহারাই পুলিস-কন্‌স্টেবলরূপে আমাদের শহরপল্লীর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে—দ্বারোয়ান হইয়া আমাদের ধনপ্রাণ-মান-মর্যাদা ও অন্তঃপুরের পবিত্রতা অটুট্ রাখে।

গ্রিপ্ ডাম্বেল, মুগুর, প্যারলেল্ বার প্রভৃতি না হইলে যে ব্যায়াম হয় না এবং সে ব্যায়ামে কিছু কাজ হয় না—এ ধারণাও ভুল। এরূপ বাজে বায়নাক্কা ঠিক সেই প্রবচনোক্তা রাধা নাম্নী নর্তকীর মতো—যে বলিয়াছিল সাত মণ তেলের প্রদীপ জ্বালিয়া না দিলে সে নাচিতে পারিবে না।···আবার এক এক স্বদেশী বা বিদেশী ব্যায়ামগুরুর এক-একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি বা সিস্‌টেম লইয়াও অনেক মারামারি, গুঁতাগুঁতি, মাথা-ঘামাঘামি আছে। কিন্তু ব্যায়ামের অব্যর্থ সুফল সম্বন্ধে যাহার ধারণা সুস্পষ্ট, সত্য সত্যই যে তাহার যৌবনের সৌন্দর্য ও শক্তিকে চরমোৎকর্ষের পথে লইয়া যাইতে সমুৎসুক, সে যাহা হোক একটা কিছু পদ্ধতি লইয়াই কাজ সুরু করিয়া দেয়,—ইজি-চেয়ারে গা ঢালিয়া দিয়া জল্পনার পাকস্থলীতে ধীরে-সুস্থে পরিকল্পনার রোমন্থন করে না।

মেয়েদের স্বাস্থ্য

মেয়েরা আজ পর্দার আড়াল হইতে সূর্যালোকে বাহির হইয়া পুরুষের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহারা যে সকল কারণে পুরুষের সমান নহেন, তন্মধ্যে সর্বপ্রধান হইল শারীরিক বল। রাস্তাঘাটে পুরুষের ন্যায় অবাধে-অসঙ্কোচে চলাফেরার মধ্যে যে কত বিপদ আছে, তাহা মাঝে মাঝে কোন কোন নিঃসঙ্গচারিণী রমণী উপলব্ধি করিয়া থাকেন। পল্লীর মেয়েদের স্বাস্থ্য দুরন্ত কায়িক পরিশ্রম, ম্যালেরিয়া, আমাশা, কলেরা ও দারিদ্র্যের প্রতিকূল আবহাওয়ায়

এখনো শহরবাসিনীদের চেয়ে কিছু ভাল আছে। কিন্তু যাহাই বলুন, নানাবিধ কারণে কি শহরে—কি পল্লীতে বাঙালি নারীর সে সনাতন সৌন্দর্য-লালিমা, সে সুষ্ঠু সুশোভন স্বাস্থ্য, অকুণ্ঠ কর্মানুরাগ আর নাই। একদিকে অবশ্য ইহার প্রধান কারণ—বিলাসবাহুল্য, নিষ্কর্ম জীবন যাপনের সুবিধা ও অধিক বয়স পর্যন্ত বাধ্যতাজনিত কুমারীত্ব, বিবিধ প্রলোভনের সহিত পীড়াদায়ক দ্বন্দ্ব, ভৌতিক বা আধ্যাত্মিক অনাচার বা ব্যভিচার ; অন্যদিকে—ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, দেশব্যাপী অস্বাস্থ্য, অশান্তি, উচ্চমূল্য, ভেজাল-ভরা পুষ্টিহীন খাদ্য, অতিরিক্ত গর্ভধারণ, সংসারের অতিগুরু বোঝা বহন।···

ব্যায়ামের পাত্র, ক্ষেত্র ও কাল

যাহা হউক, এই অধ্যায়ে আমরা এদেশের স্ত্রী-পুরুষের জন্য এমন কয়েকটী সুলভ সহজসাধ্য খালি-হাতে (free-hand) ব্যায়ামের প্রক্রিয়া বলিয়া দিতে চাই, যাহা অল্পকালের মধ্যে তাঁহাদের স্বাস্থ্যের চমৎকার উন্নতি সাধন করিতে পারিবে, তাঁহাদের কামপ্রবৃত্তিকে উচ্ছৃঙ্খলতার পথ হইতে ফিরাইয়া আনিবে, অথচ লৈঙ্গশক্তি সমৃদ্ধ ও সংস্থিতিশীল করিয়া দিবে এবং সর্বাঙ্গে একটা প্রশান্তশ্রী ফুটাইয়া তুলিবে।

এই ব্যায়ামগুলি পুরুষেরা আঠার হইতে বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সের মধ্যে যে-কোন সময়ে আরম্ভ করিতে পারেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র আসিয়া-যাইবে না। যাঁহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা, মাথাধরা, বদহজম, স্মৃতিশক্তিহীনতা, স্বাভাবিক দুর্বলতা, সহবাসে অসামর্থ্য ও কর্মে জাড্যভাব আছে, তাঁহারা অভ্যাস করুন—অল্পদিনের মধ্যে নিশ্চিত সুন্দর ফল লক্ষ্য করিবেন।

প্রথম আরম্ভ করার পক্ষে হেমন্ত বা শীত, নিদেনপক্ষে বসন্তের প্রারম্ভভাগই প্রশস্ত। শহরের মেয়েরা চৌদ্দ হইতে পঁয়ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত ব্যায়াম করিতে পারেন। ঢেঁকি, যাঁতা, ঝাঁটা, জলের ঘড়া, শিল-নোড়া প্রভৃতি সামগ্রী গৃহকর্মসাধন-উপলক্ষে পল্লীনারীদিগকে যথেষ্ট ব্যায়ামের সুযোগ দেয়। পুস্তকোক্ত ব্যায়ামগুলি অবস্থাপন্ন ঘরের স্কুল-কলেজ-পড়া অবিবাহিতা, বিবাহিতা ও সন্তানবতী মহিলাগণ, ব্যায়ামশালার সঙ্কোচশালীনতাহীন পরিবেশের মধ্যে না গিয়া, গৃহ-কোণে একান্তে অভ্যাস করিতে পারেন। এতদ্দ্বারা ভিতরকার যৌবনপ্রদ যন্ত্রগুলি সক্রিয় হইবে—স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের সহিত লালিত্য ও সুডৌলত্ব দেখা দিবে। আর একটা মহৎ উপকার সাধিত হইবে,—জরায়ুঘটিত উপসর্গাদি, অস্বাভাবিক স্থূলতা ও তজ্জাত ব্যাধিসমূহ সমূলে বিদূরিত হইবে।

ব্যায়ামের প্রাথমিক নিয়মাবলী

(১) ছাদের এককোণে, অথবা আলোবায়ুপূর্ণ নির্জন ঘরে শুধু সকাল বেলায় (অবসর ও ইচ্ছা থাকিলে দুই বেলায়ই) দশ-বারো মিনিটকাল এই ব্যায়ামগুলি করিলেই যথেষ্ট। এই সময়টুকু সমস্ত ব্যস্তবাগীশ ব্যবসাদার ও অফিসের অতিবিশ্বস্ত ও অতিব্রস্ত বাবুরাই বোধ হয় করিয়া লইতে পারেন। খুব শীতে একটা সুতী পুলওভার বা হাতকাটা ফতুয়া গায়ে থাকিবে; অন্যকালে খালিগায়ে, শুধু ল্যাঙট্ পরিয়া, ব্যায়াম করিবেন। মেয়েদের সুবিধা থাকিলে মাত্র একটা জাঙ্গিয়া বা সুইমিং-কস্‌টিউম পরিয়া ব্যায়াম করিতে পারিলে ভালো হয়।

(২) দাঁতমুখ সিঁটকাইয়া, কষ্টকাঠিন্য করিয়া, মুখ ফাঁক করিয়া কখনো ব্যায়াম করিবেন না। ঐ সময় মুখখানি

যেন প্রসন্ন, মুখমণ্ডলের পেশীগুলি শ্লথ থাকে। সহজভাবে দাঁতে দাঁত ঠেকিয়া থাকিবে ও ওষ্ঠদ্বয় স্মিতমাধুর্যে আলতোভাবে সংলগ্ন থাকিবে। সর্বদা যেন নাক দিয়া শ্বাসকার্য চলে।

(৩) ব্যায়ামের সময় মন যেন ইহার প্রতি একান্তভাবে নিবদ্ধ থাকে। 'ইহা দ্বারা আমি শক্তিমান্, স্বাস্থ্যবান, সৌন্দর্যশালী হইতেছি', আগাগোড়া এইরূপ একটা ইচ্ছাশক্তির অখণ্ড প্রয়োগ অবশ্যই করা চাই। প্রতি দফা ব্যায়ামের পর এক বা দেড় মিনিটকাল বিশ্রাম লওয়া উচিত।

(৪) ব্যায়ামের পর শীতকালে দশ মিনিট ও গ্রীষ্মকালে পনেরো মিনিট বিশ্রামের পর স্নান করিয়া ফেলা ভালো। সপ্তাহে একদিন ব্যায়াম না করিয়া কোন মুক্তস্থানে চারি-পাঁচ মাইল একটু দ্রুতপদে প্রাতর্ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন, নচেৎ শহরের সাধারণ ভ্রমণোদ্যানের শরণ লইবেন। হাঁটিবেন ঘাড় সোজা করিয়া, বুক চিতাইয়া ও তালে তালে পা ফেলিয়া; এবং বসিবেন মেরুদণ্ড যথাসাধ্য সোজা করিয়া। কোন সময়ই মুখ দিয়া শ্বাস লইবেন না।

(৫) যাঁহারা বৈকালে ভ্রমণ করেন, সাঁতার কাটেন, নৌকায় দাঁড় টানেন, ঘোড়ায় চড়েন বা অন্যবিধ খেলাধূলা করেন, তাঁহাদের দুইবেলা ব্যায়াম করিবার আদৌ প্রয়োজন নাই। যৌবনরক্ষার সবচেয়ে বড় শত্রু হইল—একদিকে তাস, দাবা ও পাশা এবং অন্যদিকে হকি ও ফুটবল খেলা। সর্বোপরি, সকাল-সন্ধ্যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৈঠকখানায় বসিয়া নিরর্থক আড্ডা জমানো ও নিত্য নেশাভাঙ করা।...সুতরাং এ সম্বন্ধে প্রত্যেকে সাবধান হইবেন।

গলফ্, পোলো, ভলিবল, হাডু-ডু, ক্রিকেট, টেনিস ও বাগানের পরিচর্যা সুন্দর স্বাস্থ্যজনক আনন্দদায়ক ক্রীড়া। রাইবেঁশে, ঢালি প্রভৃতি ব্রতচারী নৃত্য, পুরুষের স্বাস্থ্য ও আনন্দের জন্য খুবই সঙ্গত হইলেও উহা ক্বচিৎ একা-একা

নিত্য অভ্যাস করা চলে। মেয়েদের সৌকুমার্য-রক্ষার পক্ষে এগুলি আদৌ উপযোগী নহে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কথাকলি প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য, লোকনৃত্য, পূজারিণী নৃত্য, গঙ্গাযমুনা নৃত্য, আরতি নৃত্য, প্রজাপতি নৃত্য, সর্প নৃত্য, অগ্নি নৃত্য ইত্যাদির দ্বারা মেয়েদের ব্যায়ামের উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ হইতে পারে বটে; কিন্তু এগুলি ব্যায়াম হিসাবে কেহ নিত্য অভ্যাস করিতে পারিবেন না। তদুপরি কি ভারতীয়, কি বিদেশীয়, নৃত্যের মধ্যে কতকগুলি (যেগুলিতে পা, কোমর ও নিতম্বের কারিকুরী বেশী) যেমন দর্শকের নিকট কামভাবোত্তেক তেমনি আবার নৃত্যকারিণীর যৌনযন্ত্রসমূহের নিরর্থক কণ্ডূতিবর্ধক। সুতরাং কুমারীদের পক্ষে এইগুলির চর্চা খুব সঙ্গত বলা চলে না।

কণ্ডূতিবর্ধক কিসে—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয় যে, নৃত্যকালে উভয় উরুর ঊর্ধ্বভাগ অত্যধিক সংঘৃষ্ট হয়; জঘন, নিতম্ব, কটি ও নিম্নোদরের পেশীসমূহ ক্রমাগত সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলে যোনিপ্রদেশে অত্যন্ত চাপ পড়ে এবং তাহার ফলে অপরিমিত রসস্রাব হইতে থাকে। তদুপরি এইস্থানে খরতর বেগে রক্তস্রোত বহিয়া অপ্রত্যক্ষভাবে একটা উত্তেজনা ও মাদকতার সঞ্চার করিয়া পরিশেষে যান্ত্রিকভাবে তাহার প্রশমনও করে।...এইজন্য বহুকালাভ্যস্তা নর্তকীগণ পুরুষের ব্যাজস্তুতিতে, মূল্যবান উপঢৌকনে ও তাহাদের সহিত মৌখিক লীলাবিলাসে তৃপ্ত হইতে পারিলেও প্রায়শ মূল পুরুষসংসর্গে পূর্ণানন্দ লাভ করিতে পারে না। তদুপরি, বহু নর্তকীর জরায়ুচ্যুতি, বাধক, রজোনির্গম-জনিত নানাপ্রকার পীড়া হইতে দেখা যায়।

পুরুষের ব্যায়ামাদর্শ

এক-দুই। গোড়াতে ব্যায়ামের দুইটি অপরিহার্য অঙ্গ—ডন ও বৈঠক। এই দুইটি কয়েকবার করিয়া করিবেন।

সূত্রপাতে প্রত্যেক ব্যায়ামটি প্রথম-যৌবনে পাঁচবার ও শেষ-যৌবনে (বা প্রথম-প্রৌঢ়াবস্থায়) তিনবার করিয়া করা এবং শক্তি ও ইচ্ছার অনুপাতে আস্তে আস্তে বাড়াইয়া তিন-চারি গুণ পর্যন্ত উঠানো উচিত। বৈঠক্ দশবার হইতে সুরু করিয়া ত্রিশবার পর্যন্ত উঠানো যায়। বৈঠক করার সময় পায়ের পাতা ঈষৎ ফাঁক করিয়া মাটি হইতে গোড়ালিদ্বয় একটু উঁচু করিয়া রাখিবেন এবং হাত দুইটির কনুই ভাঙ্গিয়া করতল কটীদেশে রক্ষা করিবেন অথবা হাত সোজাসুজি ঝুলাইয়া রাখিয়া বসিবার কালে মুষ্টিবদ্ধ করিবেন। (১নং চিত্র দেখুন)।

[ছাপ্পান্ন বৎসর বা তদধিক বৎসর বয়সে অন্যান্য ব্যায়াম ছাড়িয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত হইলেও অন্ততঃপক্ষে একবেলা করিয়া নয়টি ডন্ ও নয়টি বৈঠক শেষ পর্যন্ত চালাইয়া যাওয়া উচিত।]

তিন। হাত দুইটি দুই পার্শ্বে ঝুলাইয়া শরীরের পেশীগুলি শ্লথ করিয়া ঠিক বৈঠকের সূচনায় যেমন দাঁড়াইয়াছেন, সেইরূপ দাঁড়ান। গভীর শ্বাস টানিয়া দক্ষিণহস্তের করতল মুষ্টিবদ্ধ করুন ও দম বন্ধ রাখিয়া ধীরে ধীরে পেশী শক্ত করিতে করিতে কনুই ভাঙ্গিয়া মুষ্টিটি স্কন্ধপ্রান্তে ছোঁয়ান। পরক্ষণে পেশীগুলি শ্লথ করিতে করিতে মুষ্টি পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনুন ও সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া দিন। একবার ডান ও একবার বাঁ হাতে এইরূপ করুন (২নং চিত্র)।

চার।—পা ও গোড়ালির সংস্থান পূর্ববৎ রাখিয়া, স্কন্ধ হইতে হাত দুইটি বাহিরের দিকে সোজাসুজি বিস্তৃত করিয়া দিন—যাহাতে দেহপার্শ্ব ও হাতের মাঝে (অর্থাৎ কক্ষদেশে) এক-একটি সমকোণের সৃষ্টি হয়। এইসময় হাত বেশ শ্লথ থাকিবে। তারপর দীর্ঘশ্বাস টানিয়া লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে করতল মুষ্টিবদ্ধ করুন্ ও পেশীগুলি শক্ত করুন, এবং

দম বন্ধ রাখিয়া, হাত দুইটির কনুই ভাঙ্গিয়া মুষ্টিদ্বয় স্কন্ধপ্রান্তের উপর স্পর্শ করান্। পরক্ষণে পেশীগুলি শ্লথ করিতে করিতে মুষ্টিদ্বয় পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনুন ও সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকুন (৩নং চিত্র)।

পাঁচ।—পূর্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া হাত দুইটি লম্বালম্বি সম্মুখের দিকে বিস্তৃত করিয়া দিন ; করতল দুইটির ভিতর দিক যেন পরস্পর সংস্পৃষ্ট থাকে। তারপর দীর্ঘশ্বাস লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুষ্টিদ্বয় বন্ধ করিয়া হাতের পেশীগুলি শক্ত করুন, এবং দম বন্ধ রাখিয়া হাত দুইটি প্রজাপতির ডানার মতো দুইপার্শ্বে মেলিয়া দিন। পরক্ষণে পেশীগুলি ঢিলা করিতে করিতে ও নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে হস্তদ্বয় পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনুন।

ছয়।—৪নং চিত্রের মতো সোজা হইয়া দাঁড়ান ; দুই পায়ের মাঝে যেন অন্তত ফুটখানেক ফাঁক থাকে ও পায়ের পাতা যেন পুরাপুরি মাটিতে লাগিয়া থাকে। কোমর হইতে পা পর্যন্ত সোজা রাখিয়া পূর্ণশ্বাস টানিয়া লউন। এখন শ্বাস বন্ধ রাখিয়া কোমরের উপরকার অংশ, মাথা সমেত ধড়টি, বাঁকাইয়া ধীরে ধীরে খিলানের মত করুন, হাতের অঙ্গুলিপ্রান্তগুলি যেন পায়ের পাতার এক ফুট সম্মুখের মাটি স্পর্শ করিবার প্রয়াস পায়। ঐ অবস্থাতেই নিঃশ্বাস ছাড়িয়া দিন এবং পুনরায় শ্বাসগ্রহণ করুন। পরক্ষণে আবার দম বন্ধ করিয়া গোড়াকার অবস্থায় ফিরিয়া আসুন।

সাত। মাথার পাশ দিয়া হাত দুইখানি বিস্তৃত করিয়া ৫নং চিত্রানুরূপ মাটিতে (বা মাদুরের উপর) শুইয়া পড়ুন। পায়ের গোড়ালি হইতে নিতম্বদেশ পর্যন্ত নিম্নশরীর শক্ত ও মাটিতে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংলগ্ন রাখিয়া শ্বাস গ্রহণ করুন। এইবার দম বন্ধ রাখিয়া হস্তসমেত শরীরের ঊর্ধ্বভাগ উঠাইয়া, বিন্দুচিহ্নিত অবস্থার ন্যায় উপবেশন করুন এবং

পরক্ষণে দেহকাণ্ড অবনমিত করিয়া করাঙ্গুলির দ্বারা পায়ের পাতা স্পর্শ করিবার চেষ্টা করুন। তারপর নিঃশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে ঊর্ধ্ববাহু হইয়া শুইয়া পড়ুন।

আট।—পূর্ব ব্যায়ামের অনুরূপ শুইয়া পড়ুন। তারপর উরুদ্বয় যথাসম্ভব পেটের উপর আনিয়া পা দুইটি ভাঙিয়া দিন। শ্বাস টানিয়া লইয়া ও দম বন্ধ করিয়া, একটু সজোরে ঝাঁকি মারিয়া হাঁটু পর্যন্ত পদদ্বয় ঊর্ধ্বদিকে কয়েকবার ঠেলিয়া উঠান। আবার নিঃশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে পা দুইটি সটান্ করিয়া মাটিতে রাখুন। পুনরায় ঐরূপ করুন। (৬নং চিত্র)।

নয়।—উপুড় হইয়া শুইয়া পড়ুন। হাত দুইটি মাথার পাশ দিয়া সমান্তরালভাবে রাখিয়া অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিতে সংগ্রথিত করিয়া ও গোড়ালিদ্বয় পাশাপাশি ছোঁয়াইয়া, পেটের উপর ভর্ দিয়া শরীরটি ধনুকের ন্যায় বাঁকাইয়া দিন। (৭নং চিত্র)।

এই ভঙ্গি গ্রহণ করিবার পূর্বে পূর্ণশ্বাস গ্রহণ করিয়া দম বন্ধ করিবেন, এবং সমস্ত পেশীগুলি যথাসম্ভব টান্ টান্ করিয়া দিবেন। এই অবস্থায় অর্ধ হইতে এক মিনিট কাল থাকিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িয়া দিয়া ও পেশীসমূহ শ্লথ করিয়া, পূর্বের ন্যায় সটান উপুড় হইয়া পড়ুন। এইটি স্থূলতা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও পেটে বায়ুবৃদ্ধি কমাইবার পক্ষে উৎকৃষ্ট। এই ব্যায়ামের শেষে উপুড় হইয়া ঘরের বা ছাদের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত গড়াইলে, উদরে মেদোবৃদ্ধি উপসর্গে আরো সুন্দর ফল পরিলক্ষিত হয়। মেদোবহুল স্ত্রীলোকের পক্ষেও এই ব্যায়ামটি অনুশীলনযোগ্য।

দশ।—পদদ্বয় অন্তত এক হাত পৃথক্ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ান। এইবার বাম পদ ফুটখানেক পিছাইয়া মাটি

হইতে গোড়ালিটি তুলুন ও বাম হাত ভাঙ্গিয়া কোমরে রাখুন। তারপর ডান পা ফুটখানেক আগাইয়া ও হাঁটুর কাছে 'দ'এর আকারে ভাঙ্গিয়া ডান হাত যতদূর সম্ভব তির্যগ্ ভাবে সম্মুখভাগে বিস্তৃত করিয়া দিন। এখন দেহকাণ্ড অবনমিত করিয়া দক্ষিণ করাঙ্গুলি-দ্বারা দূরবর্তী মেঝে স্পর্শ করিবার চেষ্টা করুন। (৮নং চিত্র)। অতঃপর উভয় পদ যথাস্থানে আনিয়া পুনরায় সোজা হইয়া, বাম পদটি আগাইয়া দিন এবং ডান হাতটি কোমরে রাখিয়া, বাম হাতের করাঙ্গুলি-দ্বারা ঐভাবে মেঝে স্পর্শ করিবার প্রয়াস পান। এইরূপ পর্যায়ক্রমে উভয় পদ-দ্বারা তাড়াতাড়ি কয়েকবার ব্যায়াম করা চাই।

এগারো।—চিৎ হইয়া মেঝের উপর শয়ন করুন। তারপর, হাঁটু দুইটি 'দ' অক্ষরের নিম্নাংশের মত ভাঙ্গিয়া দিয়া পদাঙ্গুলি ও স্কন্ধদেশের উপর ভর করিয়া হাঁটু হইতে সমস্ত শরীরটি ৯নং চিত্রানুরূপ উত্তোলন করুন। এইভাবে অর্ধ হইতে এক মিনিট কাল থাকুন। সাধ্যমতো একবার হইতে তিনবার।

বারো।—উপরোক্ত ব্যায়ামের শেষে হস্ত দুইটি বুকের উপর আড়াআড়িভাবে রাখিয়া দিয়া, দম বন্ধ করিয়া, মস্তক ও পদাঙ্গুলির উপর শরীরের সমস্ত ভার স্থাপন করিয়া, একটি খিলানের আকার ধারণ করুন (১০নং চিত্র)। এই অবস্থায় আধ হইতে এক মিনিট কাল থাকিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িয়া দিন; এবং পুনরায় শ্বাস লইয়া হস্তদ্বয় মস্তকের দুই পার্শ্ব দিয়া ঘুরাইয়া হাতের পাতার উপর ভর দিয়া, মাটি হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া বিন্দুরেখাঙ্কিত ভঙ্গির ন্যায় উচ্চ খিলানবৎ অঙ্গবিন্যাস করুন। এইভাবে আধ হইতে এক মিনিট কাল থাকিয়া, ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে সোজাসুজি চিৎ হইয়া শুইয়া বিশ্রাম করুন। একবার করিলেই যথেষ্ট।

তেরো।—স্বচ্ছন্দভাবে হাত ঝুলাইয়া একখানি পা ঈষৎ সম্মুখ দিকে অগ্রসর করিয়া দাঁড়ান। তারপর পশ্চাতের পায়ের গোড়ালির উপর ভর দিয়া যাঁতার কীলকের মতো উহাকে কেন্দ্র করিয়া শরীরটিকে সম্মুখ হইতে দক্ষিণে, দক্ষিণ হইতে সম্মুখে ও তারপর বামে যথাসম্ভব ঘুরান্ বা মোচ্ড়ান্—(গতি অনেকটা হইবে রিভল্ভিং টেব্ল্-ফ্যানের মতো)। দেহের সঙ্গে সঙ্গে হাত দুইটিও মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় ঘুরাইতে হইবে। পায়ের পাতা দুইটি স্থানচ্যুত হইবে না, কিন্তু উভয় পার্শ্বে ঘুরিতে পারিবে। একবার ডান পা, আবার বাম পা অগ্রসর করাইয়া ঐরূপ অভ্যাস করুন (১১নং চিত্র দেখুন)।

চৌদ্দ।—বক্ষস্থল চিতাইয়া দিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া, মাথা পশ্চাৎ দিকে ঈষৎ হেলাইয়া দিয়া দাঁড়ান্। এইভাবে দাঁড়াইয়া, পশ্চাতের পায়ের গোড়ালি উঁচু করিয়া, সম্মুখের পায়ের পাতার উপর শরীরের ভার বেশীর ভাগ চাপাইয়া দিন্। এইবার একটু করিয়া শ্বাস লইতে লইতে হাত দুইটি ফাঁক করিয়া আধভাঙ্গা ও শ্লথভাবে (১১নং চিত্রের বিন্দুকৃত রেখার ন্যায়) সম্মুখ দিকে তালে তালে আস্তে আস্তে উঠাইয়া দিন। এইবার দম বন্ধ করিয়া ত্রয়োদশ সংখ্যক ব্যায়ামের ন্যায় শরীরটি একদিন হইতে অন্যদিকে মোচ্ড়ান্। দৃষ্টি যেন সর্বদা উর্ধ্বগামী হস্তের অঙ্গুলিগুলির উপর নিবদ্ধ থাকে।

দ্রষ্টব্য:—সর্দিকাশি হইলে, সারারাত্র জাগরণ হইলে অথবা শরীর অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত বোধ করিলে, ব্যায়াম করিবার প্রয়োজন নাই। স্ত্রীসম্ভোগের ছয়ঘণ্টার মধ্যে ব্যায়াম না করাই শ্রেয়। শায়িত অবস্থার ব্যায়ামগুলি হজমশক্তি ও রতিক্ষমতাবর্ধক এবং তেরো ও চৌদ্দ সংখ্যক ব্যায়াম লালিত্য-ও-ভারসাম্য-কারক।

মেয়েদের ব্যায়ামাদর্শ

এক।—পুরুষের নবম সংখ্যক ব্যায়ামে ও এই ব্যায়ামে কোন তফাৎ নাই। ঠিক ঐরূপ পদ্ধতিতে এই ব্যায়ামটি করুন; কেবল হাত দুইটি মাথার দুই পার্শ্ব দিয়া ধনুকাকারে না তুলিয়া, দেহকাণ্ডের দুই পার্শ্বে সংলগ্ন রাখুন। এই অবস্থায় আধ মিনিট হইতে এক মিনিটকাল অবস্থান করুন (চিত্র নং ১২)।

দুই।—কনুই দুইটি 'ব' অক্ষরের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পরস্পরগ্রথিত অঙ্গুলি সমেত করতলদ্বয় কাঁধের পশ্চাতে রাখিয়া শুইয়া পড়ুন। তারপর ১৩নং চিত্রের ভঙ্গিতে মাথা ও গোড়ালির উপর ভর দিয়া দেহকাণ্ডটি ঊর্ধ্বে তুলিয়া খিলানের ন্যায় আকার ধারণ করুন। অবস্থান-কাল আধ হইতে এক মিনিট্ কাল। দীর্ঘশ্বাস লইয়া এই ভঙ্গি ধারণ করিবেন, এবং যতক্ষণ এই অবস্থায় থাকিবেন, শ্বাস বন্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিবেন। তারপর ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে শ্লথভাবে মেঝেতে শুইয়া পড়িবেন।

তিন।—দুই করতলের পশ্চাদ্দেশ উল্টাউল্টিভাবে পরস্পর সংলগ্ন করিয়া ১৪নং চিত্রের (ক-ভঙ্গি) অনুরূপ ঊর্ধ্ববাহু হইয়া দাঁড়ান। তারপর ঐ অবস্থা হইতে হাত দুইটি বিচ্যুত করিয়া, দেহকাণ্ডের দুইপার্শ্বে সোজাসুজি প্রলম্বিত করিয়া দিতে হয় (খ-ভঙ্গি); তারপর বাহুদ্বয় ভাঙ্গিয়া করতল মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কটিদেশ স্থাপন করুন (গ-ভঙ্গি)। পুনরায় গ হইতে খ'এ ও খ হইতে 'ক এ ফিরিয়া যান। এইভাবে পাঁচ হইতে দশ বার। বাহু ঊর্ধ্বে তুলিবার সময় শ্বাস টানিতে ও নামাইবার সময় নিঃশ্বাস ফেলিতে হয়।

চার।—সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কোমরে হাত রাখিয়া, মাথা-সমেত বুকটি যতদূর সম্ভব পশ্চাদ্দিকে ধীরে ধীরে

হেলাইয়া দিতে হইবে। এই সময় ধীরে ধীরে বুকের মধ্যে শ্বাস টানিয়া লউন। তারপর করাঙ্গুলিসংযুক্ত করতলদ্বয় স্কন্ধের পশ্চাতে রক্ষা করিয়া সম্মুখের দিকে যতটা সম্ভব ঝুঁকিয়া পড়ুন; এবং এই সময় ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া দিন (১৫ নং চিত্র)। প্রত্যহ পাঁচবার হইতে আরম্ভ করিয়া কালক্রমে দশে উঠুন।

পাঁচ।—ভূমিতল হইতে আন্দাজ আড়াই ফুট উপরে অর্থাৎ ব্যায়ামকারিণীর নাভিদেশের উচ্চতা যতখানি, ততখানি উচ্চে তাহার হাত দুইটি সম্মুখভাগে বিস্তৃত করিয়া, জানালার দুইটি পাশাপাশি গরাদে শক্ত করিয়া ধরুন্ ও শরীরটি শক্ত করিয়া সোজাসুজি পিছন দিকে মেলিয়া দিন; এই সময় পদাঙ্গুলি কেবল মাটি ছুঁইয়া থাকিবে [১৬ নং চিত্র]। বাহুদ্বয় ও পৃষ্ঠদেশ চিত্রপ্রদর্শিত ভঙ্গিতে একবার ভাঙ্গিয়া ও আর একবার সোজা টান্‌টান্ করিয়া দিতে হয়। টান্‌টান্ করিবার সময় শ্বাস ভিতরে লইবেন ও হাত ভাঙ্গিবার সময় শ্বাস পরিত্যাগ করিবেন।

ছয়।—দুই হাত 'ব'এর আকারে কাঁধের পার্শ্বে ভাঙ্গিয়া ও করাঙ্গুলিগুলি মাথার পিছনে পরস্পর গ্রথিত অবস্থায় রক্ষা করিয়া, চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িতে হইবে। তারপর এই অবস্থা হইতে নিদ্রোত্থিতের মতো ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিতে হইবে। এই সময় পিঠ বেশ খাড়া রাখিতে ও উরুসমেত পদদ্বয় মেঝের সহিত টান্‌টান্ করিয়া ছোঁয়াইয়া রাখিবেন। ইহার পর পিঠ-সমেত ঘাড়টি ভিতরের দিকে নোয়াইয়া কনুই দুইটি হাঁটুর উপর সংস্পৃষ্ট করিবার চেষ্টা করুন (১৭ নং চিত্র)।...আবার মেঝেতে শুইয়া পড়ুন। মেঝেতে শুইয়া পড়িবার সময় নিঃশ্বাস পরিত্যাগ, উঠিয়া বসিবার সময় শ্বাসগ্রহণ করিতে ও ঘাড় নামাইবার সময় দম বন্ধ রাখিতে হয়।

সাত।—১৮নং চিত্রপ্রদর্শিত ক-ভঙ্গির অনুরূপ হাত দুইটি (কমলা-মস্তকে করী-শুণ্ডের ন্যায়) ভাঙ্গিয়া, পদদ্বয়

ইঞ্চি নয়েক ফাঁক করিয়া দাঁড়ান। এইবার দেহের ঊর্ধ্বাংশ খ-ভঙ্গির মতো অবনমিত করিয়া দুই করদ্বয়-দ্বারা পায়ের 'গোছ' বেড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করুন। পায়ে হাত দিয়া ৫।৭ সেকেণ্ড দম বন্ধ রাখিলে ভালো হয়। আবার ক-ভঙ্গিতে ফিরিয়া যান। শরীর ঊর্ধ্বে তুলিবার সময় দীর্ঘশ্বাস টানিতে ও অবনমনের সময় নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হয়।

আট।—হাত দুইখানি ঝুলাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়ান্। শ্বাস টানিতে টানিতে, বামহাত মুষ্টিবদ্ধ করুন্ ও কনুই ভাঙ্গিয়া মুষ্টিবদ্ধ করতল বগলের নীচে রক্ষা করুন; এইবার দম বন্ধ করিয়া মুখখানি যথাসাধ্য দক্ষিণ দিকে ফিরান্ ও দক্ষিণ স্কন্ধসমেত ডান হাতখানি নীচের দিকে নামাইয়া দিন্ (১৯নং চিত্র)। এইবার নিঃশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে ও পেশীগুলি আল্গা করিতে করিতে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসুন এবং হাত বদল্ করুন।

নয়-দশ।—সর্বশেষে পুরুষদের ১৩ ও ১৪নং ব্যায়াম দুইটি অভ্যাস করুন।

দ্রষ্টব্য।—গর্ভসময়ে, প্রসবের পর দুই মাস কাল ও ঋতুস্রাব-কালে এই ব্যায়ামগুলি করিবার প্রয়োজন নাই।

বিশ্রাম

বিশ্রাম যৌবনরক্ষার এক অনিবার্য উপাদান। বিশ্রাম কথাটা বলিলেই যদিচ আমাদের নিদ্রার বিষয় অগ্রেই মনে পড়ে, তথাপি জাগ্রৎ অবস্থায় মস্তিষ্ক পরিচালন অথবা কোন একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সক্রিয়ভাবে অঙ্গসঞ্চালন না করিলেও তাহাকে বিশ্রাম বলিয়া বুঝিতে হইবে। স্নান, আহার, ভ্রমণ, বক্তৃতা, অভিনয়, সঙ্গীত প্রভৃতিতে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের পেশীসমূহ অল্পবিস্তর নিয়োজিত হয়; তাহাকে ঠিক বিশ্রাম বলা চলে না। যে সকল গ্রন্থপাঠে গভীর চিন্তাশক্তি

প্রযুক্ত হয়, তাহাকেও বিশ্রাম বলা উচিত নহে।···বহুক্ষণ কাজ করিবার পর শরীর শ্রান্ত হইয়া যে নিষ্ক্রিয় শিথিলতার জন্য স্বতঃই ব্যগ্র হইয়া উঠে, তাহার নাম বিশ্রাম। তবে অবিশ্রান্ত কাজে ফাঁকি দিয়া চুপচাপ বাড়ি বসিয়া কাটানো অথবা দিনরাত বিছানায় শুইয়া সিগারেট টানা ও রসাল লঘু সাহিত্যের উপর দিয়া ক্রমাগত চোখ বুলানোকে বিশ্রামের ব্যভিচার ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।···

যুবকযুবতীমাত্রই দিনরাতে অন্তত আটঘণ্টা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া সাতঘণ্টা ও বৃদ্ধবৃদ্ধা ছয়ঘণ্টা কর্মে ব্যাপৃত থাকিবেন। ইহার দ্বারা দেহগত ও মস্তিষ্কগত দুই প্রকার কাজের কথাই আমরা বুঝাইতে চাহি। ঠিক যত ঘণ্টা কাজ করিবেন, তত ঘণ্টা নিদ্রা দিবেন; অর্থাৎ যুবা বয়সে আট ঘণ্টা; প্রৌঢ়কালে সাত ঘণ্টা; ও বৃদ্ধবয়সে ছয় ঘণ্টা নিদ্রার নিশ্চিত প্রয়োজন। বাকি সময়টুকু—স্নান, আহার, খোশ্-গল্প, আলাপ-আলোচনা, খেলাধূলা, ভ্রমণ, আমোদপ্রমোদ, থিএটার-বায়োস্কোপ দেখা, সংবাদপত্র, নাটক-নবেলাদি পাঠ, ভজনপূজন, সাধু-চিন্তা প্রভৃতিতে ব্যয়িত হইতে পারে।

বৃদ্ধদের স্বভাবত ঘুম অত্যন্ত আল্গা ও কম হয়। সুতরাং বালকবালিকা বা যুবকযুবতীদিগকে তাঁহারা বেশীক্ষণ অকাতরে ঘুমাইতে দেখিলেই রুষ্ট হন, এবং কেহ কেহ ভোর পাঁচটায় জাগিয়াই পুত্রকন্যাদের ঘরের দরজায় ধাক্কা মারিয়া, প্রাতরুত্থানের উপকারিতা সম্বন্ধে বিরক্তিকর বক্তৃতা সুরু করেন। ইহা অন্যায় ও অযৌক্তিক।···

বিশ্রাম ও নিদ্রাকালে শরীরের ক্ষয়পূরণ হয়। জাগ্রৎ অবস্থায় যে সকল পেশীতন্তু শ্রান্ত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে—যতখানি জীবনীশক্তি ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা অন্তঃপ্রকৃতির রসায়নাগার এই সময় সম্পূরণ করিয়া দেয়। ঠিক যেরূপ

দিবাভাগে কূপের জল তুলিয়া তুলিয়া নিঃশেষ হইলে, রাত্রিকালে আবার নূতন জলে তাহা পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। যাহার শরীরে সক্রিয়তা যত অধিক, তাহার নিদ্রার তত বেশী প্রয়োজন।

তবে সূর্যোদয়ের পর শয্যায় থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর এবিষয়ে আর দ্বিমত নাই। দিবা-নিদ্রাও খুব স্বাস্থ্যকর নহে। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে যদিও উহা বিশেষ অপকারক নয়, অন্যসময়ে কিন্তু একেবারে অনুমোদন করা যায় না। দ্বিপ্রহর রাত্রির (অর্থাৎ রাত্রি বারোটার) অন্তত একঘণ্টা পূর্বে শয্যাগ্রহণ করা অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু আহারের অব্যবহিত পরেই নিদ্রা যাওয়া কিছুতেই উচিত নয় ; অন্তত একঘণ্টা বা দেড়ঘণ্টা পরে শয্যাগ্রহণ প্রশস্ত।

কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি দিন, কি রাত্রি, ঘরে প্রচুর বাতাস খেলিতে দেওয়া চাই। ঠাণ্ডা-লাগা জুজুর ভয়ে যাহারা বেশী জড়োসড়ো হয়, সর্দিকাশি তাহাদিগকে তত বেশী করিয়া চাপিয়া ধরে। বেশীদিন ধরিয়া রোগীর সহিত একঘরে ও অধিকবয়স্কদের সহিত একশয্যায় কোনক্রমেই শয়ন করিবেন না। শয়নকক্ষের নিকট যেন অধিক গাছপালা ও ভিতরে অধিক আসবাবপত্র না থাকে। চিৎ বা উপুড় হইয়া মুখ ফাঁক করিয়া ও লেপ-কাঁথায় মুখ ঢাকিয়া কখনো নিদ্রা যাইবেন না। রাত্রিতে শয়নের পূর্বে খোলা বাতাসে একটু বেড়াইবেন এবং একগ্লাস ঠাণ্ডা জল পান করিবেন।

ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠ ঔষধাবলী

শুধু ঔষধ-দ্বারা যৌবন অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভবপর নহে, ফিরাইয়া আনার আশা করাও বাতুলতা। অসুখ ও অকালজরা আসে নিজের দোষে, পিতামাতা বা পূর্বপুরুষের দোষে। কোনস্থানের পরিপার্শ্ব ও জলবায়ুর দোষেও কতকটা আসিতে পারে বটে। কিন্তু আহারে-বিহারে-কার্যে-চিন্তায় সাবধান হইলে, তাহাকে অনেকটা দাবানো যায়। যৌবনে পারতপক্ষে কোনরূপ ঔষধ ব্যবহারেরই প্রয়োজন হয় না—যদি বাল্যে ও কৈশোরে জীবন সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কার্যে, বাক্যে ও চিন্তায় কোন সময় যেন অনিয়ম, অসন্তোষ ও দুর্বলতার ছায়ামাত্র না পড়ে। তাহা হইলে দেখিবেন, ডাক্তারবৈদ্যের খরচ অনেক কমিয়াছে, মহাকালের রোষোদ্যত তরঙ্গোচ্ছ্বাস বহুদূর পিছাইয়া গিয়াছে।

দৈবদুর্বিপাকে অথবা নিজের দোষে প্রথমযৌবনে যাঁহারা স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও মনের শক্তি হারাইয়াছেন, অথবা হারাইতে বসিয়াছেন, তাঁহাদিগের জন্য কয়েকটি সুপরীক্ষিত দেশী ও বিদেশী ভেষজের সন্ধান দেওয়া হইতেছে। শেষ-যৌবনে বা প্রৌঢ়ত্বের প্রথমভাগে ইহাদের দ্বারা স্পষ্ট সুফল লাভের সম্ভাবনা। বৃদ্ধকালের প্রারম্ভে অর্থাৎ ৫০-৫৫ বৎসর বয়সের পর এগুলির দ্বারা বড় বেশী উপকার হইবে বলিয়া আমরা আশ্বাস দিতে পারি না।

আমেরিকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার W. J. Robinson যথার্থ বলিয়া গিয়াছেন, "The worst enemies of old age are a good cook and a young wife." সুতরাং বার্ধক্য-সমাগমে এই দুইটি শত্রুকে দূরে রাখাই সমীচীন। তখন অতীত সুখের দিনের বেশী চিন্তা না করিয়া ও অনাগত জীবনের উজ্জ্বল ছবি হৃদয়ে আঁকিয়াই যেন বাকি দিনগুলি কাটে। ঘড়ির কাঁটা পশ্চাতে সরাইয়া দিবার ব্যর্থ চেষ্টা না করাই শ্রেয়।

ধাতুদৌর্বল্য, শুক্রতারল্য প্রভৃতি

(ক) তিসী—এক পোয়া; কাঁচা হরিদ্রা—এক পোয়া; কার্পাসতুলার বীজমধ্যস্থ শাঁস—আধপোয়া; ছোট শাল্মলী (শিমুল) গাছের মূল—দেড় পোয়া; খুর্মা—এক পোয়া; চিনি—অর্ধসের; বিশুদ্ধ মাখন-জ্বালানো গব্যঘৃত—অর্ধসের; নির্জল দুগ্ধের পাৎলা ক্ষীর—এক সের আন্দাজ।

কার্পাস তুলার ভাল বীজ পোয়া দেড়েক যোগাড় করিয়া আনিবেন। তারপর একটা পরিষ্কার শিল বা পিঁড়ির উপর দুই-চারিটি করিয়া রাখিয়া হামান্‌দিস্তার ডাঁটির দ্বারা ঈষৎ ঘা মারিয়া উপরকার শক্ত খোলা ভাঙ্গিলেই ভিতরকার শাঁস বাহির হইয়া পড়িবে; উহা সযত্নে বাহির করিয়া আধপোয়া আন্দাজ সংগ্রহ করুন।

খুর্মা এক জাতীয় শুষ্ক সুস্বাদু গাছপাকা খেজুর ফল বিশেষ। ঢাকা, চট্টগ্রাম, কলিকাতা ও পশ্চিমাঞ্চলে বড় বড় শহরে মেওয়া-বিক্রেতাদের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়।

তিসী, কাঁচা হরিদ্রা, কার্পাস-তুলার বীজমধ্যস্থ শাঁস, শাল্মলী মূল ও খুর্মা—এইগুলি ঋতুহিসাবে তিন হইতে সাতদিন রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, একত্র হামানদিস্তায় চূর্ণ করিবেন। কাঠকয়লা বা অতি ক্ষুদ্র চেলা-কাঠের মৃদু অগ্নিতাপে একখানি মাজা কড়ায় (অ্যালুমিনিয়মের হইলে ভাল হয়) ঘৃত চাপাইয়া দিন। ঘৃতের ফেন্ কাটিয়া উহা নিস্তব্ধ হইলে, উহাতে পূর্বোক্ত ঔষধের চূর্ণগুলি মিশাইয়া বেশ করিয়া নাড়িতে থাকুন। দুই-চারি মিনিট পরে চিনি ও ক্ষীর ঢালিয়া দিয়া অন্তত মিনিট দশ-পনেরো কাল খুন্তি দিয়া নাড়ুন। সমস্ত জিনিসটী মোহনভোগের ন্যায় হইলে, কড়া নামাইয়া, ঔষধটি শীতল করিয়া, একটি নূতন মাটির বা কাচের জারের মধ্যে (ভাল করিয়া ধুইয়া-মুছিয়া) রাখিয়া দিন।

প্রত্যহ সকালে খালিপেটে এক তোলা মাত্রায় খাইয়া, এক পোয়া দুধ পান করা চাই। হজমশক্তি বুঝিয়া ক্রমশ ঔষধের মাত্রা দুই তোলায় ও দুধের মাত্রা অর্ধসেরে উঠাইতে পারেন। ঔষধ সেবনকালে শাক, অম্ল, দধি ও খেঁসারির ডাল খাওয়া নিষেধ।...**প্রত্যেক প্রকার ঔষধ সেবনারম্ভের পর চারি সপ্তাহ স্ত্রীসংসর্গ বন্ধ রাখিতে হইবে।**

(খ) ভূঁমিকুষ্মাণ্ড (ভুই-কুমড়া) এক প্রকার কন্দ বিশেষ, দেখিতে অনেকটা চুপড়ি-আলুর ন্যায়। ভূমিকুষ্মাণ্ড আনিয়া, উহার খোসা ছাড়াইয়া, বেশ টুক্‌রা করিয়া কুটিয়া, একটা নূতন মাটির শরায় রাখিয়া, অন্তত সাতদিন রৌদ্রে শুকান্। এইবার উহার কুড়ি তোলা ওজন করিয়া লউন। আর একটি ভূমি কুষ্মাণ্ড আনিয়া, খোসা ছাড়াইয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া শীলে থেতো করুন। কুড়ি তোলা আন্দাজ উহার রস ছাঁকিয়া লইয়া পূর্বোক্ত শুষ্ক কুষ্মাণ্ড-খণ্ডগুলির গাত্রে বার কয়েক মাখাইয়া, ক্রমাগত ৭দিন ধরিয়া রৌদ্রে রাখুন। এইবার ঐগুলিকে শুষ্কাবস্থায় গুঁড়া করিয়া, উহার সহিত কুড়ি তোলা বিশুদ্ধ গব্যঘৃত ও বারো তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া একটী চওড়া-মুখ বোতলের মধ্যে রাখিয়া দিন। সিকি তোলা হইতে আধ তোলা পরিমাণে এই ঔষধটি (বসন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় একবেলা ও শরৎ-হেমন্ত-শীতে দুইবেলা) অর্ধ পোয়া হইতে এক পোয়া দুগ্ধের সহিত গুলিয়া পান করিবেন। ইহা বীর্য-গাঢ়কারক ও বর্ধক এবং আংশিক রতিশক্তিহীনতারও অপনোদনকারক।

(গ) অনেকে বোধ হয় জানেন না, হরিতকীর বলবীর্যবর্ধক গুণ অসীম। বাজার হইতে কিছু হরিতকী কিনিয়া আনিয়া, বীজ বাদ দিয়া, টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া রৌদ্রে দিবেন। পরে উহা হামান্‌দিস্তায় গুড়া করিয়া একটা শিশিতে ভরিয়া রাখিবেন। শরৎকালে ঈষৎ চিনির সহিত, হেমন্তকালে শুঁট্-চূর্ণের সহিত, শীতকালে পিঁপুলচূর্ণের সহিত, বসন্তকালে

কয়েক ফোঁটা মধুর সহিত, গ্রীষ্মকালে যৎসামান্য সৈন্ধব লবণের গুঁড়ার সহিত—অন্তত ২ তোলা হরিতকী-গুঁড়া মিশাইয়া, রাত্রে শয়নের পূর্বে খাইলে শুক্র গাঢ় হয়—যৌবন স্থির থাকে।

(ঘ) বিনা উত্তেজনায় বা অকারণে জাগ্রৎকালে বীর্যপাত হইতে থাকিলে, নিম্নলিখিত ডাক্তারী প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনটি নিজের গৃহ-চিকিৎসককে দিয়া লিখাইয়া লইয়া তদনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া ব্যবহার করিতে পারেন। কোটি কোটি লোক ইহাতে উপকৃত। তিনি ইহার মাত্রার ঈষৎ হেরফের করিতে পারেন। একমাত্রায়—

Strychnine Sulph.	gr. $\frac{1}{30}$th
Hydrastinae hydrochlor	gr. $\frac{1}{4}$th
Ergotine	gr. ii

একমাত্রা করিয়া খাওয়ার পর প্রত্যহ দুইবার। হাইড্র্যাসটিনির পরিবর্তে (অথবা পৃথগ্‌ভাবে প্রত্যহ একবার) এক গ্রেন করিয়া Styptol বা Stypticin ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারেন।

অস্বাভাবিক স্বপ্নদোষ

(ক) কাবাবচিনি ৵০ (অর্থাৎ একটি রূপার দুয়ানি বা এক ভরির আট ভাগের এক ভাগের ওজন), শুষ্ক আমলকী ৵০, বিহিদানা ৵০, ঈশবগুল ৵০, কর্পূর ৩ রতি,—এইগুলি এক ছটাক জলে প্রাতঃকালে ভিজাইয়া রাখিবেন; ঐ জল প্রত্যহ রাত্রে শয়নের পূর্বে ছাঁকিয়া সেবন করিতে হয়।

(খ) আফিম সিকিরতি, কর্পূর অর্ধরতি ও কাবাবচিনিচূর্ণ অর্ধতোলা একত্রে মিশাইয়া শয়নের সময় দুই-এক ঢোক জলের সহিত সেবন করিলে, স্বপ্নদোষ-ব্যাধি নিশ্চিত অল্পদিনে আরোগ্য হইবে।

(গ) অ্যালোপ্যাথিক ঔষধের মধ্যে নিম্নে একটি প্রেসক্রিপ্‌সন্ লিখিয়া দেওয়া হইল। উহা আমেরিকার প্রথিতযশা ডাক্তার রবিন্সনের প্রস্তুত। গৃহ-চিকিৎসকের দ্বারা এই ধরণের একটি পেসক্রিপ্‌সন লিখাইয়া লইয়া, ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া আনিতে পারেন। প্রতিমাত্রায়—

Stronti Rromidi	gr. v
Camphorae monobrom	gr. ii
Lupilini Optimi	gr. v
Hyoscyominae hydrobrom	gr. $\frac{1}{100}$

এই ঔষধের কুড়িটি বড়ি প্রস্তুত করাইয়া রাখিতে পারেন। প্রত্যহ শয়নের পূর্বে এক ঢোক ঠাণ্ডা জল সহ এক বড়ি করিয়া সেবন করিলে, দশ দিনের মধ্যেই অদ্ভুত উপকার প্রত্যক্ষ করা যাইবে।

শয়নকালে প্রস্রাব করিয়া যৌনযন্ত্র ও অণ্ডকোষের তলা ঠাণ্ডা জলে ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিবেন; কোমরে, শিরদাঁড়ার নিম্নাংশে ও কাঁধে জল থাব্‌ড়াইয়া দিবেন। রাত্রিতে খাওয়ার পর খোলা বাতাসে খানিকক্ষণ পায়চারি করিতে করিতে ওষ্ঠদ্বয় কাকচঞ্চুবৎ সূচালো করিয়া, শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে গভীরভাবে বাতাস টানিয়া লইতে থাকিবেন। একটু কঠিন বিছানায় কাৎ হইতে শুইবেন। সম্ভব হইলে, মধ্যরাত্রে একবার উঠিয়া মূত্রত্যাগ করিবেন। খুব ভোরে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সারিয়া দুই-এক মাইল প্রাতর্ভ্রমণের অভ্যাস রাখিবেন।

পুরুষত্বহীনতা ও ত্বরিৎস্খলন

দেশ-বিদেশে এতৎ সম্বন্ধে লক্ষ লক্ষ রকমের ঔষধ বাহির হইয়াছে; এখনো হইতেছে। কিন্তু কয়টীতে কতখানি উপকার হয়, কয়টীতে কিছুই হয় না, তাহা জানিবার উপায় নাই। ভয়কাতর অজ্ঞান ব্যক্তি হাতের কাছে যতগুলি পায়—একটার পর একটা করিয়া পরীক্ষা করিয়া যায়। যদি কোনটাতে কিছু ফল পাইল—ভাল; নচেৎ শেষে হাল ছাড়িয়া দিয়া রোগ পুষিয়া রাগ করিয়া চুপ্‌চাপ থাকে।

সাধারণত চল্লিশের পর হইতে আমাদের দেশে পুরুষের রতিশক্তি একটু একটু করিয়া কমিতে থাকে; পঞ্চাশের পর হ্রাসের গতি দ্রুত ও স্পষ্টতর হয়; ষাট-বাষট্টির পর ক্বচিৎ উহা কোন ব্যক্তিতে অবশিষ্ট থাকে। ইহা হইল স্বাভাবিক ভোগসামর্থ্যের বয়োগত মানদণ্ড। বাহাত্তর পর্যন্ত লক্ষের মধ্যে একজনের ছিটে-ফোঁটা শক্তি অবশিষ্ট থাকিতে দেখা যায়।

কিন্তু প্রথম বা শেষ-যৌবনে যাহাদের রতিশক্তিহীনতা সুস্পষ্ট রোগরূপে দেখা যায়, তাহাদের রোগের অনেকগুলি কারণ থাকিতে পারে। ইহার মধ্যে সর্বপ্রধান চারিটি কারণ উল্লেখযোগ্য:—(১) জন্মাবধি ভিতরকার কোন যান্ত্রিক্ বৈকল্যবশত পুরুষত্বহীনতা, (২) আবাল্য অতিরিক্ত শুক্রপাত, লৈঙ্গ ব্যভিচার বা পুরাতন সিফিলিস গনোরিয়ার ফলে পুরুষত্বহীনতা, (৩) দীর্ঘকাল ধরিয়া বীর্যরক্ষা করিবার দৃঢ় প্রয়াস বা বহুদিন যাবৎ বাধ্যতাজনিত সঙ্গমবিরহের ফলে পুরুষত্বহীনতা, ও (৪) ভীতি, দৌর্বল্য, শোক, আপন সহবাসশক্তি সম্বন্ধে অত্যধিক ও অহেতুক সংশয় বা আত্মসংকোচের ফলে পুরুষত্বহীনতা।

প্রথমোক্ত কারণে যাঁহাদের পুরুষত্বহীনতা হয়, তাঁহাদের চিকিৎসা-কার্য প্রায় ক্ষেত্রেই সহজসাধ্য নহে, এবং বহুক্ষেত্রে নৈরাশ্যজনক হয়। দ্বিতীয় কারণ-সংযুক্ত ক্ষেত্রে সিফিলিস্ বা গনোরিয়ার ডাক্তারী চিকিৎসা করাইয়া রোগমুক্ত হইয়া, তবে সঙ্গমশক্তিহীনতার চিকিৎসায় চেষ্টাবান হইতে হয়।...মানসিক পুরুষত্বহীনতা বশত সদ্যোবিবাহিত সুস্থদেহী অনেক যুবকই প্রথম প্রথম মনঃকষ্ট পান্। স্ত্রীর পুনঃপুন বাধাপ্রদান বা অত্যধিক উদাসীনতা, বা সঙ্গম-ক্ষমতা লইয়া লঘু বিদ্রূপ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন পরীক্ষার দুশ্চিন্তা, পত্নী পছন্দ না হওয়া, সঙ্গমকালে কোনরূপ দুর্গন্ধ-দ্বারা অভিভূত হওয়া, রমণকালে 'কে দেখিয়া ফেলিল—কেহ জানিতে পারিলে কি লজ্জারই না কারণ হইবে।'— এইরূপ আশঙ্কা, অথবা 'আমি ইহাকে আনন্দদানের অযোগ্য,' 'এ দেবী, পশুর ন্যায় ইহাকে আমি কলঙ্কিত করিতেছি, ছিঃ।'...ইত্যাদি হীনমনোভাব অনেক সময় মানসিক পুরুষত্বহীনতার জনক।...বলাবাহুল্য, প্রায় ক্ষেত্রেই ইহা সাময়িক বা আপেক্ষিক উপসর্গ।

এইরূপ বহু কেস্ লেখকের নিজের কাছে আসিয়াছে এবং এখনো আসে। তদুপরি, বহু ডাক্তার-বন্ধুর নিকটও আসিয়া থাকে। জনৈক ডাক্তারের নিকট কিছুদিন পূর্বে এইরূপ একটি কেস্ আসিয়াছিল। তৎসম্বন্ধে উপদেশ চাহিবার পূর্বে ডাক্তারবাবু রোগীর সমস্ত ইতিহাসটি আমার নিকট বর্ণনা করেন। ছাব্বিশ বৎসরের মোটামুটি সুস্থ যুবক কিছুদিন পূর্বে একটি উনিশবৎসর বয়স্কা চলনসই সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী যুবতীকে বিবাহ করিয়াছিল। যুবকটি কৈশোরে কয়েক বৎসর পাণিমেহন ও কয়েকবার বিযোনিমৈথুন করিয়াছিল বটে; কিন্তু বিবাহের চারিবৎসর কাল পূর্ব হইতে ছিল স্বেচ্ছাব্রত ব্রহ্মচারী—কামনার দ্বার সে জোর করিয়া রুদ্ধ রাখিয়াছিল।...বেচারা ফুলশয্যার রাত্রি হইতেই স্ত্রীগমনের চেষ্টা করিতেছে, কৃতকার্য হয় না। কোন কোন দিন জনন-যন্ত্র মাত্র মিনিট খানেকের জন্য দৃঢ় হয়। কিন্তু তাহা যোনির প্রবেশ-পথ

আসিয়াই স্তিমিত হইয়া পড়ে ও সঙ্গে সঙ্গে রেতঃস্খলন হইয়া যায়। কোন কোন দিন অর্ধোন্নত হয়; কোন দিন পুনঃপুনঃ চেষ্টা সত্বেও উহাকে উচ্ছ্রিত করা যায় না। স্ত্রী ইহাতে খুশি না বিরক্ত, তাহা মুখ ফুটিয়া বলে নাই। ইদানীং বরং তাহার ব্যর্থপ্রয়াস ও ছট্‌ফটানি দেখিয়া দুই-একদিন মাঝে মাঝে মুখ চাপিয়া হাসিয়াছে। রোগীর ইহাতে হয় স্ত্রীর ও নিজের উপর ভীষণ ক্রোধ। লজ্জায় সে মরিয়া যায়, শেষে আত্মহত্যা করিতে সাধ যায়।...

এইরূপ ক্ষেত্রে রোগীর উচিত সঙ্গম-প্রচেষ্টা কিছুদিন বন্ধ রাখা ও পৃথক শয্যায় শয়ন করা। ইতোমধ্যে মনে মনে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব ও সাহস সঞ্চয় করা এবং 'তাহার শক্তিহীনতার কোন সঙ্গত কারণ নাই' এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করা। ঘোড়ায় চড়া, বাইসাইকেল চড়া বা ল্যাঙ্গট আঁটা যদি অভ্যাস থাকে, তাহা বন্ধ করা চাই। রাত্রিতে আহারের পর কিছুক্ষণ বেড়াইয়া বেড়ানো এবং স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করা উচিত। সাধ্যায়ত্ত হইলে স্ত্রীকে লইয়া মাঝে মাঝে থিয়েটার, বায়োস্কোপ, সার্কাস প্রভৃতিতে যাইতে পারিলে ভালো হয়। মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর স্ত্রীর সহিত হাস্য-বিদ্রূপ, গল্পগাছা করা ও সুবিধামত তাহার সর্বাঙ্গে প্রচুর উপচার প্রয়োগ করাও কর্তব্য। শয়নকালে ঘরের আলো একেবারে নিবাইয়া দিতে এবং বিছানায় বেলা, রজনীগন্ধা, চন্দ্রমল্লিকা, হাস্নাহানা প্রভৃতি ফুল ছড়াইয়া রাখিতে হয়। এ সময় পত্নীর উচিত স্বামীর মনে সাহস ও উৎসাহের সঞ্চার করা এবং তাঁহার সোহাগ-আদরের যথোপযুক্ত প্রতিদান দেওয়া।

যাঁহাদের বয়োবৃদ্ধি হেতু বীর্যধৃতিশক্তি হ্রাস পাইয়াছে, তাঁহারা নিম্নলিখিত ঔষধটি ব্যবহার করিলে, আশা করি কিছু-না-কিছু সুফল লাভ করিবেন।

(ক) বাটীর নিকট যাঁহাদের বটগাছ আছে, তাঁহারা প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় খালিপেটে একটি বাতাসার উপর তিন

ফোঁটা সদ্যোছিন্ন বটপাতার বোঁটার রস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বাতাসাটি চিবাইয়া খাইয়া ফেলিবেন। সাত-আটদিন অন্তর এক ফোঁটা করিয়া মাত্রা চড়াইতে আরম্ভ করিয়া, পর্যায়ক্রমে সাত ফোঁটা পর্যন্ত উঠিবেন। এইরূপ তিন মাস কাল ব্যবহার করিলে, অন্তত তিন বৎসরকাল বেশ সন্তোষজনক অবস্থা থাকিবে। এই সহজপ্রাপ্য সুফলপ্রদ ঔষধটি ব্যবহরকালে প্রত্যহ কম করিয়া আধসের এক-বলক-তোলা উষ্ণ দুগ্ধপান করা এবং সকাল-বৈকালে দুই-তিন মাইল করিয়া ভ্রমণ করা উচিত। ভাজা ডিম, কাঁকড়া, বেশী টক্, উত্তেজক পানীয় বা কোনরূপ চাটনি, আচার প্রভৃতি ব্যবহার নিষিদ্ধ।

প্রত্যহ স্নানের পূর্বে গোপন স্থানে ও কটিদেশ হইতে নিতম্বশীর্ষ পর্যন্ত পৃষ্ঠদেশে উত্তমরূপে সরিষার তৈল মালিশ করিলে, ইন্দ্রিয় বহুদিন বেশ সুস্থ কর্মক্ষম অবস্থায় থাকে। ইন্দ্রিয়-শৈথিল্যের সূচনায় সপ্তাহে দুই-একদিন সন্ধ্যার পর ঈষদুষ্ণ সরিষার তৈলে ৫।৭ ফোঁটা পরিষ্কার তার্পিন তৈল মিশাইয়া লইয়া, কটিদেশ হইতে নিতম্বের খাঁজ পর্যন্ত বিস্তৃত মেরুদণ্ডের উপর ও মূলসমেত সমস্ত লিঙ্গে উহা কয়েক মিনিট ধরিয়া মালিশ করিলে, ইন্দ্রিয় অনেকটা দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হইতে পারে।

যখন কিছুতেই কোন ফল হয় না, তখন কোন এম্-বি ডাক্তারের দ্বারা নিম্নলিখিত ঔষধটি লিখাইয়া ও ডাক্তারখানা হইতে প্রস্তুত করাইয়া, তাঁহার উপদেশমতো দিনে দুই বা তিনবার ব্যবহার করিতে পারেন। একমাত্রায়—

(খ)	Arseni Trioxidi	gr $\frac{1}{60}$
	Strychnine Sulph.	gr $\frac{1}{30}$
	Calcium Glycerophosphates	gr iii
	Massae Ferri carbonatis	gr ii

[(গ) **চিকিৎসকগণের প্রতি নিবেদন এই যে,**—তাঁহাদের বলভরসার উপর বহু রোগীর স্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্তি নির্ভর করে। খাওয়ার ঔষধ সপ্তাহে একদিন বন্ধ রাখিয়া, কোনো কোনো কঠিন neurastheniaর ক্ষেত্রে ঐ দিন $^1/_{60}$ হইতে $^1/_{30}$ gr. Strychnine অধস্ত্বাচিক্ বা আন্তঃপৈশিক ইঞ্জেকশন দিলে কখনো কখনো চমৎকার ফল দর্শে। একটু বেশীদিনের পুরাতন রোগ হইলে, Phospho-Lecithin, Thyroid Extract ও Fellow's Syrup of Hypo-phosphites Comp. সর্বপ্রকার নার্ভজনিত (nervous) রতিশক্তির দুর্বলতায় অনেকখানি উপকার দর্শায়। ইতালীর যৌনতত্ত্বজ্ঞ অধ্যাপক বরুকচো হাইপোফস্ফাইটের অজস্র গুণকীর্তন করিয়াছেন। Testogen বা ঐ জাতীয় অ্যাম্পূল্ ইঞ্জেকসনে কয়েকটি ক্ষেত্রে বেশ ভাল ফল দেখা গিয়াছে। দিনে Strycenine, Hypophosphites প্রভৃতি সেবনের সহিত সন্ধ্যার পর ২-৪ ড্রাম Sherry পান করিলে দ্রুততর অধিকতর ফল দর্শে। শেরীর মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশী বলিয়া হয়তো সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের পক্ষে উহা একাদিক্রমে কিছুদিন ব্যবহার করা সম্ভবপর হইবে না।]

যাহা হউক, আমরা এবার সাধারণ পুরুষত্বহীনতার কয়েকটি আহার্যদ্রব্য, ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ ও কবিরাজী ঔষধের নাম ও ব্যবহার-বিধি দিব। পছন্দমত ইহার যে-কোন একটী ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারেন। পনেরো দিন ব্যবহারে কোন প্রত্যক্ষ ফল না ফলিলে, অন্য একটি নির্বাচন করিয়া লইবেন। এইভাবে যে-কোন তিনটি পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

(ঘ) দুই বা তিন কাঁচ্চা মাসকলাইয়ের দাল (কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর পক্ষে খোসা সমেত হইলে ভালো হয়) সমপরিমাণ ঘৃতে ভাজিয়া আন্দাজ দেড় পোয়া হইতে আধসের দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া, পরিমাণমতো তালমিশ্রীর গুঁড়া বা মধু-সংযোগে পায়সের মতো করিয়া প্রত্যহ বৈকালে খাইবেন। গ্রীষ্মকালে একদিন অন্তর ও শীতকালে প্রত্যহ সেবন

বিধেয়। দুই সপ্তাহ হইতে একমাস ব্যবহারে ফল পাওয়া যায়। অম্ল বোধ করিলে, সকল উপাদানেরই পরিমাণ কিছু কমাইয়া দিবেন।

(ঙ) টাটকা রুই মাছের পেটি (কোল্) অথবা তাজা পুঁটি মাছ ছাঁকা ঘৃতে ভাজিয়া, সপ্তাহে দুই-তিনবার আহারের সহিত খাইলে, বীর্য গাঢ় ও রতিশক্তি স্পষ্টত সমৃদ্ধ হয়। ইহা খাদ্যের সামিল ; সুতরাং ইহার সহিত অন্য ঔষধও ব্যবহার করা চলে।

(চ) সন্ধ্যার পর শিমূল গাছের শুষ্ক সরু মূল অথবা তুলসীর মূল (অর্ধ ইঞ্চি হইতে এক ইঞ্চি পরিমাণ), ৫।৭টী কাবাবচিনি, একটী ছোট এলাচ, দুইটি লবঙ্গ, সামান্য দারুচিনি ও জয়িত্রী, সাজা-পানের সহিত চিবাইয়া খাইলে, সে রাত্রিতে সাময়িকভাবে বীর্যধৃতিশক্তি অপেক্ষাকৃতভাবে বাড়িয়া যায়। পরিশেষে ছিব্‌ড়া ফেলিয়া দেওয়াই উচিত।

(ছ) শুষ্ক আমলকী কিনিয়া (বা কাঁচা আমলকী কুড়াইয়া) উহা রৌদ্রে শুষ্ক ও পরে চূর্ণ করিয়া লইবেন। খাওয়ার পাতে সাধারণত যতখানি পরিমাণে লবণ দেওয়া হয়, ঠিক ততটুকু পরিমাণ ঐ গুঁড়ার সহিত কাঁচা আমলকীর কয়েক ফোঁটা রস, সামান্য চিনি, কয়েক ফোঁটা ঘৃত ও মধু মিশাইয়া লইয়া পাৎলা কাদার মতো করিয়া ফেলিবেন। সন্ধ্যার পর উহাই চাটিয়া চাটিয়া খান ; তাহা হইলে ক্রমে পুরুষত্ব বৃদ্ধি পাইবে।

(জ) চারা শিমূল গাছের শুষ্ক মূল ৵০ ওজন, শুষ্ক আমলকী ৵০ ওজন, জায়ফল ৪ রতি একত্র গুঁড়াইয়া, সামান্য মাখন ও মিছরির গুঁড়ার সহিত প্রত্যহ সকালে বাসি-পেটে খাইবেন।

(ঝ) এক তোলা যষ্টিমধু-চূর্ণ (ডাক্তারখানায়ও Pulv Liquorice নামে পাওয়া যায়), আধতোলা ঘৃত ও আধতোলা

মধু একত্রে সেবন করিয়া, পরে পোয়াটাক ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পান করিলে, কামবেগ খুব তীব্র হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা ঐ সঙ্গে কোষ্ঠ-পরিষ্কার ও ক্ষুধাবৃদ্ধিও হয়।

(ঞ) একটি খুব ছোট পাথরবাটি অথবা চীনামাটীর বাটিতে খাঁটি মধু লইয়া, উহার ভিতরে একটি ছোট দেশী পিঁয়াজ চাকা-চাকা করিয়া কাটিয়া সেগুলি মধুতে সম্পূর্ণ ডুবাইয়া সাররাত্র রাখিয়া দিন। একটুকরা ভিজা নেকড়া বাটির মুখে বাঁধিয়া খোলা বাতাসে শিশিরে রাখিয়া দিলে আরও ভাল হয়। পর দিন প্রাতে মধুমাখা পিঁয়াজখণ্ডগুলি উঠাইয়া চিবাইয়া খান; তাহা হইলে ২ সপ্তাহের মধ্যে লিঙ্গশৈথিল্য অনেকটা দূরীভূত হইবে।

(ট) রোহিত মৎস্যের ডিম জলে সিদ্ধ করিয়া, পরে পাতলা কাপড়ে ছাঁকিয়া, ঐ ডিম গাওয়া ঘৃতে অল্প ভাজিয়া লউন। অথবা, হাঁস বা মুরগীর ডিম প্রায় অর্ধসিদ্ধ (ভিতরটি কাদাকাদা আকারের) করিয়া এইভাবে ঘিয়ে ভাজিয়া লউন। শীতকালে একটু ভিনেগার ও সৈন্ধব লবণ সহযোগে এই ডিম-ভাজা ভক্ষণে শুক্রবৃদ্ধি পায় ও কামভাবও প্রবল হয়।

কচ্ছপের ডিম, লোনা ইলিসের ডিম ভাজা, কাঁকড়া, সামুদ্রিক পায়রা-চাঁদা, পিঁয়াজ, রশুন, জাফ্রান, জৈত্রী প্রভৃতি দ্রুত কামবেগবর্ধক।

(ঠ) শুকরের চর্বি (Adeps Preparatus, ১ পাউণ্ড টিন কলিকাতার বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়) ৪ আউন্স লইয়া, অতি-মৃদু অগ্নিতাপে গলাইয়া, উহার মধ্যে একটি রশুনের ৪।৫টি কোয়া ঈষৎ থেঁতো করিয়া ফেলিয়া দিন। মিনিট পাঁচেক পরে কোয়াগুলি তুলিয়া, তৈলবৎ চর্বি উনান হইতে নামাইয়া লউন। ইতঃপূর্বে এক আউন্স তার্পিন তৈলে এক ভরির আট ভাগের এক ভাগ ভালো মৃগনাভি সাতদিন ধরিয়া ভিজাইয়া রাখিবেন; দুই-তিনদিন

ছিপি আঁটিয়া রৌদ্রে রাখিতে পারেন। এইবার ঐ তার্পিন তৈল গলিত চর্বির মধ্যে মিশাইয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া শিশির মধ্যে রাখুন। এই মালিস ঈষত্তপ্ত, গলিত অবস্থায় লিঙ্গ, মুষ্কদ্বয় ও কোমরের শিরদাঁড়ার উপরে ও উভয় পার্শ্বে প্রত্যহ মালিশ করা লিঙ্গশৈথিল্যে বিশেষ উপকারী। ইহা আমি বহু ক্ষেত্রে ব্যবহার করাইয়া চমৎকার ফল লক্ষ্য করিয়াছি।

ইহার সহিত—প্রতিবারে সুপ্রস্তুত "শ্রীগোপাল তৈল" আধাআধি পরিমাণ মিশাইয়া সকাল-সন্ধ্যায় মর্দন করিলে, আরো দ্রুত উপকার দর্শায়।

(ড) এই সকল ঔষধে যখন কোন ফল হয় না, যখন কিছুদিন তন্ত্রোক্ত "অমৃতপ্রাশ ঘৃত" প্রতিদিন বৈকালে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত ঈষৎ চিনি দিয়া আধ তোলা আন্দাজ খাইবেন। সকালে "চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ" এক বড়ি খলে মাড়িয়া একটী পানের রস ও ৩০ ফোঁটা মধু-সহযোগে সেব্য। চন্দ্রোদয় মকরধ্বজে সন্তোষজনক ফল না হইলে, "বৃহচ্চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ" কিনিয়া সন্ধ্যাকালে উহার দুই রতি পরিমাণ সাজা পানের সহিত চিবাইয়া চিবাইয়া সেবন করিবেন। বিশ্বাসযোগ্য কবিরাজ বা নামজাদা ঔষধালয় হইতে ঔষধ কিনিবেন। এই সঙ্গে শ্রীগোপাল তৈল ও ঠ-নং চর্বি মালিশ চলিতে থাকিবে।

ক্বচিৎ কখনো পরিমাণমতো মদনানন্দ মোদক কোনদিন রাত্রি আট্‌টা লাগাৎ খাওয়া চলিতে পারে। কিন্তু সাধারণ দোকানদারগণ ইহাতে আয়ুর্বেদোক্ত সমস্ত উপাদানগুলি না দেওয়ায় ও সিদ্ধিবীজের পরিবর্তে সিদ্ধিপাতা বেশী পরিমাণে দেওয়ায় বার্ধক্যস্পৃষ্ট ও দুর্বলহৃদয় লোকের পক্ষে ইহার অনুমোদন আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। তাহা ছাড়া, ইহাতে অনেক সময় সকাল বেলা একটা গভীর অবসাদ আসে, মাথা ধরে, কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে। বৎসরের মধ্যে বিশেষ একটা স্ফূর্তির দিন ইহার ব্যবহার আপত্তিকর না হইলেও কদাচ যেন উহা নিত্যনৈমিত্তিক নেশায় পরিণত না হয়। মোদকের আরোগ্যকর গুণ বিশেষ কিছু নাই। পঞ্চাশের পর ইহা না ব্যবহার করাই নিরাপদ মনে করি।

আর একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিবেন। মদনানন্দ মোদক ব্যতীত অন্যান্য আরোগ্যকর ঔষধ ব্যবহারের অন্তত পনেরো দিন পরে দুঃসহ মদন-সন্তাপ উপস্থিত হইলে, একবার অভিগমন বিশেষ আপত্তিকর হইবে না। তবে একটু বল পাইলেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া পুনঃপুন স্ত্রীগমনের শোচনীয় পরিণতি অবশ্যম্ভাবী জানিবেন।

কৃশতা দূরীকরণ

হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁট, গোলমরিচ, পিপ্পলী (পিঁপুল), গজপিপ্পলি, জাঙ্গি হরীতকী, যষ্টিমধু, বেতাড়ক, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শোনাইল, দারুচিনি, মোটা (বড়) এলাইচ, লবঙ্গ, অনন্তমূল, সালসা, কাবাবচিনি, রেউচিনি, জায়ফল, জৈত্রী। এই একুশ প্রকার (দুই একটি পদ যোগাড় করিতে না পারিলে, অগত্যাপক্ষে বাকিগুলি) সমভাগে দুইতোলা পরিমাণ গ্রহণ করিয়া, আগের দিন রাত্রিতে কিঞ্চিৎ ছেঁচিয়া বত্রিশ তোলা জলে ভিজাইয়া রাখিবেন। পরের দিন খুব মৃদু কাঠের জ্বালে চড়াইয়া দিবেন এবং তিনভাগ জল মরিয়া গেলে অর্থাৎ আট তোলা থাকিতে নামাইয়া লইবেন। এ-বেলা চারিতোলা এবং ও-বেলা চারিতোলা ঈষদুষ্ণ অবস্থায় পনেরো দিন সেবন করিয়া উপকার পাইলে, আরো অন্তত একমাস বা দেড়-মাস ব্যবহার করিবেন। ইহাতে শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও যৌবনোচিত স্বাস্থ্যসম্পন্ন হয়। এই ঔষধ কার্তিক হইতে মাঘের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সেবন আরম্ভ কথা বিধেয়।

বাজীকরণ ও যৌবনসংরক্ষণ

এক পোয়া পরিমাণ আলকুশীর বীজ ধুইয়া, দুই সের নির্মল গাভীদুগ্ধে ফেলিয়া ধীরে ধীরে কাঠের জ্বালে সিদ্ধ করিবেন। দুগ্ধ মরিয়া অন্তত ½ গাঢ় অর্থাৎ আধসের পরিমাণ হইলে, ঐ দুধ একেবারে ফেলিয়া দিয়া, কোমলতা-

প্রাপ্ত বীজগুলির খোসা ধীরে ধীরে ছাড়াইয়া ফেলিবেন। তদনন্তর ভিতরকার শাঁস উত্তমরূপে শীলে বাটিয়া, এক তোলা ওজনের (বা ছোট কুলের মতো আকারে) এক-একটি বড়ি পাকাইয়া ফেলুন। তারপর সেইগুলিকে অল্প কাঠের জ্বালে ছাঁকা গব্যঘৃতে একটু কড়া-কড়াভাবে ভাজুন। ঠাণ্ডা হইয়া গেলে, এইগুলিকে খুব গাঢ় চিনির রসে ধীরে ধীরে ডুবাইয়া দিন্। আধ ঘন্টার মধ্যে সেই চিনির রস-মাখা বটিকাগুলি একটা কাঁচের বা মাটির চিতানো বড় পাত্রে এমনভাবে রাখুন যে, উহারা গায়ে গায়ে বেশী জোড়া লাগিয়া না যায়। তারপর পাত্রে এরূপ পরিমাণে মধু ঢালিয়া দিন যাহাতে বটিকাগুলি সম্পূর্ণ ডুবিয়া যায়। ইহাই তন্ত্রোক্ত 'বানরী বটীকা'। প্রত্যহ সকাল ও বৈকালে একটী করিয়া বড়ি মধু হইতে তুলিয়া ধীরে ধীরে উত্তমরূপে চিবাইয়া খাইবেন। খাইতে অত্যন্ত সুস্বাদু। বীর্যস্তম্ভনে, শুক্র-গাঢ়করণে ও যৌবনোচিত স্বাস্থ্যসৌন্দর্য আনয়নে ইহার তুল্য ঔষধ আর নাই। সঙ্গতি থাকিলে বারমাসই খাইতে পারেন।

ব্রণ-মেচেতা-নাশক, লাবণ্যবর্ধক প্রভৃতি

(ক) যাহাদের গাত্রবর্ণ সূর্যের তাপে পুড়িয়া গিয়াছে অথবা দীর্ঘদিনের রোগে বিবর্ণ হইয়াছে, তাহার আধ-পোয়া আন্দাজ কাঁচা দুগ্ধের সহিত আধখানি পাতিলেবুর রস মিশাইয়া, তদ্দারা একটু বড় স্পঞ্জ বা ছোট তোয়ালে ভিজাইয়া স্নানের পূর্ব্বে ৮।১০ মিনিট ধরিয়া গাত্রমার্জন করিতে হয়। কিছুক্ষণ পরে ঈষদুষ্ণ জলে গাত্র-মুখ ধুইয়া ফেলিতে হইবে।

(খ) খাঁটি জলপাইয়ের তৈল (প্যালেস্টাইন বা ইতালীদেশীয় Olive Oil হইলে ভালো হয়) এবং অএল্ অব রোজমেরী সমপরিমাণে আউন্স দুয়েক করিয়া মিশাইয়া লইয়া উহাতে ফোঁটা ২০-২৫ নাট্‌মেগ তৈল

Oil of Nutmeg) মিশান। ইহার মধ্যে কোন বিলাতী কোম্পানির প্রস্তুত *Oleum Cantharidis* (এক বা দুই আউন্স শিশিতে কিনিতে পাওয়া যায়) নব্বই ফোঁটা ফেলিয়া দিন। সমগ্র শিশি ৩ দিন ধরিয়া রৌদ্রে রাখুন। প্রতিরাত্রে শয়নের পূর্বে সামান্য পরিমাণে এই সংমিশ্রণ লইয়া, মাথার তালুতে ও চুলের গোড়ায় কয়েক মিনিট মৃদুভাবে ঘষিয়া, পরে ব্রাশ দিয়া আঁচড়াইয়া শুইবেন। দিন কয়েকের মধ্যে মাথায় নূতন চুল বাহির হইবে, পুরাতন চুলগুলি শক্ত হইবে। [এই ঔষধের উপাদানগুলি কলিকাতার কলুটোলা বা মুর্গীহাটায় কিনিতে পাওয়া যাইবে।]

(গ) খাঁড়ি মুসুরির দাল একটু গব্যঘৃতে ৫।৬ মিনিট মৃদু আঁচে ভাজিয়া নামাইয়া ফেলিবেন। তারপর অল্প পরিমাণ কাঁচা দুগ্ধের সহিত মোলায়েম ভাবে বাটিবেন—যেমন হলুদ বাটা হয়। উহা রাত্রে শয়নের পূর্বে সমস্ত গলদেশ সমেত মুখমণ্ডলে পাৎলা পর্দার মত নিভাঁজ করিয়া লাগাইয়া দিবেন। শুকাইয়া গেলে বিছানায় শুইয়া পড়িবেন। পরদিন প্রাতঃকালে মুখ ধোওয়ার সময় ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া শুষ্ক দাল তুলিয়া ফেলিবেন। ইহার দ্বারা মুখের মেচেতা, ব্রণ, শুষ্কদাগ প্রভৃতি দশ-পনেরো দিনের মধ্যে দূরীভূত হইয়া লাবণ্যবৃদ্ধি করিবে।

শীতকালে ইহার সহিত ৫।৬ ফোঁটা গ্লীসারিন ও ২।৩ ফোঁটা পরিষ্কার রেড়ীর তৈল মিশাইয়া লাগাইলে, ফাটা ও মুখচর্মের কর্কশতা সারিয়া যায়। প্রত্যহ ঔষধটি প্রয়োজন অনুযায়ী নূতন করিয়া প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। একজনের পক্ষে এককাঁচ্চা আন্দাজ দালই যথেষ্ট।

(ঘ) অথবা, খাঁড়ি মুসুরের দাল ও শ্বেত তিল সমপরিমাণ অন্তত ছয় ঘণ্টা ধরিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিবেন। ভিজা তিলগুলি কুলার উপর ফেলিয়া কিছুক্ষণ ঘষিয়া লইবেন। সন্ধ্যাকালে জল ফেলিয়া দুধের পাৎলা সরের সহিত

কয়েক ফোঁটা গোলাপের নির্যাস মিশাইয়া, এই দুইটি দ্রব্য মোলায়েমভাবে বাটিয়া, উপরোক্ত উপায়ে মাসখানেক মাখিতে পারিলে, মুখের লাবণ্য ও চর্মের বর্ণসুষমা আশাতীতরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কালো রং শ্যামবর্ণ ও শ্যাম গৌরবর্ণ ধারণ করিবে। আশানুরূপ ফললাভের জন্য পূর্বোক্ত ক-নং যোগটিও এই সঙ্গে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। ছুলি বা মেচেতা থাকিলে, উপরন্তু প্রত্যহ বৈকালে দুই বড়ি করিয়া 'ক্যালসিআম ল্যাকটেট' খাইতে হয় এক মাস কাল।

(ঙ) গঙ্গামৃত্তিকা বা যে-কোন নদীগর্ভের কাঁকরশূন্য শুভ্র এঁটেল মাটি একটি ক্ষুদ্র তাল পাকাইয়া শুকাইয়া রাখিবেন।...শয়নের পূর্বে সামান্য কাঁচা দুগ্ধে ঐ মাটি ঘষিয়া ও উহাতে শ্বেতচন্দন-বাটা অতি অল্প পরিমাণে মিশাইয়া সারা মুখে মাখিবেন। শুকাইয়া গেলে বিছানায় শুইয়া নিদ্রা যাইবেন। পরদিন সকালে ঈষৎ উষ্ণ জলে কিছুক্ষণ ধরিয়া স্পঞ্জ বা গামছা দ্বারা ঘষিয়া প্রলেপ তুলিয়া ফেলিবেন। তারপর শুষ্ক তোয়ালে দিয়া মুখ মুছিয়া বরফের টুকরা (অভাব পক্ষে মেটে কলসীর জল) ৫।৭ মিনিট কাল মুখে ঘষিতে থাকুন। পরে মুখখানি মুছিয়া ফেলুন। সুপ্রসিদ্ধা ফিল্ম অভিযাত্রী জীন্ হার্লো মুখে বরফ ঘষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন।...অর্ধেক পরিমাণ চালমুগরা তৈলের সহিত চতুর্থাংশ Olive Oil ও চতুর্থাংশ Sandal-wood Oil মিশাইয়া একটি শিশিতে রাখিয়া দিবেন; দিনের বেলায় ১ বার মুখে মাখিবেন। ইহাও কর্কশতা, কুঞ্চন ও কালো দাগ দূর করিয়া মুখে যৌবন-জ্যোতি ফুটাইবার আর একটি অমোঘ ঔষধ।

(চ) গোঁড়া লেবুর এক ছটাক পরিমাণ রস পাথরের বাটি বা চীনা মাটীর কাপে করিয়া কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখিয়া দিন। পরে উহার সহিত এক আনা ওজনের (অর্থাৎ এক ভরির ষোল ভাগের এক ভাগ)

সোহাগার খৈ-চূর্ণ * ও চা-চামচের অর্ধ চামচ দোবরা নতুবা ছোট-দানাওয়ালা চিনি মিশাইয়া, শিশিতে ভরিয়া, কর্ক আঁটিয়া রাখিয়া দিন্।

ইহা একাদিক্রমে চারি-পাঁচদিন পর্যন্ত ব্যবহার চলিতে পারে, পরে পুনরায় নূতন ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয়। প্রত্যহ এই দ্রব তিন-চারিবার ব্রণে বা বয়স-ফোটের উপর মাখাইয়া অঙ্গুলি দ্বারা মৃদু মৃদু ঘষিয়া দিবেন; যেন নখ না লাগে। ১০।১২ দিনে সুফল ফলিবে।

(ছ) ভৃঙ্গরাজ ও কেশুতে পাতার রস মস্তকে কিছুক্ষণ ঘষিয়া ঘষিয়া মাখিয়া, আধ ঘণ্টা পরে ধুইয়া ফেলিলে; অথবা একটি আমের আঁটির মধ্যকার শাঁস ও একটি কাঁচা আমলকী সম পরিমাণ বাটিয়া তাহার মিশ্রিত রস সপ্তাহে দুইদিন করিয়া মাখিলে, চুলের অকালপক্কতা কিছুদিন পরে নিবারিত হয়, চুলও ঘনসন্নিবদ্ধ হইয়া উঠে।

[মাথা নেড়া বা চুল ছোট করিয়া ঔষধ মাখিলে ভাল ফল দেখা যায়, নতুবা সপ্তাহে একদিন মাথায় তৈল না মাখিয়া, স্নানের পূর্বে মাথায় সাবান, মাথা-ঘষা মশলা অথবা শ্যাম্পু পাউডার ব্যবহার করিয়া চুলের গোড়াগুলি পরিষ্কার ঝর্‌ঝরে করিয়া লওয়া উচিত।]

---

* যেনিয়ার দোকান হইতে দুই পয়সার সোহাগা কিনিয়া আনিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরায় পরিণত করিবেন। কয়েক টুকরা সোহাগা অ্যালুমিনিয়ের প্যান বা লোহার চাটুর উপর রাখিয়া মৃদু অগ্নিতাপ দিলেই উহা বিজগুড়ি কাটিয়া অধিকতর শ্বেতবর্ণ ধারণ করিবে। তৎক্ষণাৎ নামাইয়া লইলেই সেগুলি সোহাগার খই হইল। ইহার অভাবে ডাক্তারখানা হইতে এক আউন্স Borax কিনিয়া আনিতে পারেন,—সস্তান কথা।

(জ) একপোয়া আন্দাজ জলে একটি ছোট চামচপূর্ণ ভালো চা ফুটাইয়া, তাহাতে একটুকরা (এক কাঁচার বেশী নয়) ফট্‌কিরি-চূর্ণ মিশাইয়া, প্রায় শীতল অবস্থায় সেই জলদ্বারা সারা মাথা ঘষিয়া ঘষিয়া ধৌত করিলে, চুলউঠা নিবারিত হয়। পর পর অন্তত সাত বা ঊর্ধ্বপক্ষে দশ দিন ব্যবহার করা চাই।

(ঝ) আমের আঁটির শাঁস ও হরীতকী সমান ভাগে লইয়া ঈষৎ দুধের সহিত বাটিয়া বেশ মাখনের মতো করিয়া ফেলিবেন। উহা চুলের মধ্যে প্রলেপ দিয়া একরাত্রি রাখিয়া, পরের দিন স্নান করিয়া, চুল কিছুক্ষণ ব্রাশ্ করিবেন। এইরূপ ৩।৪ দিন করিলেই খুস্কি ও মরামাস বিদূরিত হইবে।

(ঞ) সোঁদাল পাতা ও শ্বেত করবীর পাতা ঘোলের সহিত বাটিয়া সমস্ত গাত্রে উত্তমরূপে মাখিয়া, মিনিট পনেরো-কুড়ি পরে সাবান দিয়া স্নান করিয়া ফেলিবেন। অথবা, শ্বেতচন্দন ও দারুহরিদ্রা পাটায় ঘষিয়া একটু ননীর সহিত মিশাইয়া গাত্রে মাখিবেন; আধ ঘণ্টা পরে ভিজা গামছায় গা মুছিয়া ফেলিতে পারেন। তাহা হইলে গ্রীষ্মকালীন চুলকণা, ঘামাচি, ফুস্থুড়ি প্রভৃতি বিনষ্ট হইবে। আসল চুলকনায় কষ্ট পাইতে থাকিলে, উপরোক্ত যোগের সহিত কয়েকটি কাক-মাছি গাছের পাতার রস মিশাইয়া লইবেন। রাত্রিতে চালমুগরা-জলপাই-চন্দন তৈলের পূর্বোক্তরূপ মিশ্রণটি মাখিবেন।

(ট) অর্জুন গাছের ছাল ঘোলের সহিত ঘষিয়া চন্দনের মতো পাৎলা করিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা কুলের আঁটির মজ্জা (ভিতরকার শাঁস) ও দধির সর একসঙ্গে বাটিয়া প্রলেপ দিলে, মুখের মেচেতা উঠিয়া গিয়া বদনমণ্ডলে নূতন শ্রী ফুটিয়া উঠে। প্রত্যহ প্রলেপ যেন দুই-তিন ঘণ্টা কাল অঙ্গে লিপ্ত থাকে।

(ঠ) কয়েকটি মূলার বীজ টক্ দধির সঙ্গে বাটিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা কেয়া পাতার রস পাঁচ-সাত দিন দুইবেলা মুখে মাখিলে, ছুলির দাগ উঠিয়া যাইতে পারে।

মুখের রং সুন্দর করিবার পাউডার

(ক) Zinc Oxide (অথবা Stearate of Zinc), Boric Acid Powder, Arrowroot বা barley প্রত্যেকটি এক আউন্স করিয়া ডাক্তারখানা হইতে কিনিয়া আনিবেন। উহার সহিত অর্ধ আউন্স ফটকিরি গুঁড়া করিয়া মিশাইবেন ও সমস্ত জিনিসগুলি কোন রেশমী বা সূক্ষ্ম কাপড়ে দুইবার ছাঁকিয়া লইবেন। এইবার এই সংমিশ্রিত দ্রব্যগুলিতে ৮।১০ ফোঁটা যে-কোন ফুলের আতর বা ফোঁটা ত্রিশেক্ কোনরূপ এসেন্স মিশাইয়া দিলেই চমৎকার লাবণ্যবর্ধক পাউডার তৈয়ারী হইয়া গেল। ইহা গায়ে মাখিলে, ঘামাচি প্রভৃতিও মরিয়া যাইবে। মুখে লাগাইবার পূর্বে সাবান দিয়া মুখ বেশ ভালো করিয়া ধুইয়া ও মুছিয়া ফেলিবেন।...

আরো দুইটি ফেস্ পাউডারের যোগ বিবৃত করিতেছি :—

(খ)	French Chalk	4 oz	(গ)	White Kaolin Powder	10 oz
	Starch (arrowroot)	12 oz		French Chalk	5 oz
	Zinc Oxide	2 oz		Bismuth oxychloride	1 oz
	Bismuth oxychloride	1 oz		Carmine red (লালিমার জন্য)	1 grain
	Otto Lavender			Boric acid powder	2 oz
	or Otto White Rose	1 dram		Oil of Neroli	20 drops
	& Sandal Wood Oil	50 drops		Essence of Musk	30 drops

একত্রে সকল দফাই পাংলা সূক্ষ্মবোনা কাপড়ে পর পর দুইবার ছাঁকিয়া লইবেন। গ-সংখ্যক পাউডারটি ঈষৎ জলে গুলিয়া সন্ধ্যার পর মুখে, হাতে ও গলায় সমানভাবে ডলিয়া মাখিবেন—ঠিক মেমের মত দেখাইবে। ইহা বাজারের শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান দেশী বা বিদেশী পাউডারের সমকক্ষ।

মুখ ও হাতের কুঞ্চিত রেখাবলী দূরীকরণ

Alum (ফট্‌কিরি-গুঁড়া)	10 gr.	Tict. of Benzoine	1 fl. dram
Zinc Sulphate	5 gr.	Eue de Cologne	60 drops
Glycerine	1 fl. dram	Distilled water	1 pint

ইহার অধিকাংশ দ্রব্যই শহরে কোন বড় ডাক্তারখানায় পাইবেন। ফ্রান্স বা জর্মেনিতে প্রস্তুত ইউ-ডি-কোলন্-এর ছোট শিশি পাওয়া গেলে খুব ভাল হয়, নতুবা দেশী কিনিবেন। প্রথমে একটি শিশির মধ্যে আউন্স চারেক পরিশ্রুত জলে ফটকিরি গুঁড়া ও জিঙ্ক্ সাল্‌ফেটের গুঁড়া ভাল করিয়া নাড়িয়া মিশ্রিত করুন্। বাকি জলের সহিত গ্লীসারিন সংমিশ্রিত করিয়া, এসেন্স্ ও বেঞ্জইন ঢালিয়া দিন্। এইবার দুইটি দ্রব্য একটা বড় শিশিতে মিশ্রিত করিয়া, শিশির মুখ আঁটিয়া খুব নাড়াচাড়া করিতে থাকুন্। একপ্রকার পাৎলা দুগ্ধবৎ লোশন্ তৈয়ারী হইবে। ইহা লাগাইলে চর্মকুঞ্চন দূর হইয়া, অল্পদিনে গাত্রত্বক্ মসৃণ ও কোমল হয়।...

যৌবন শুধু দেহের নহে, মনেরও। একে অন্যের বহুলাংশে মুখাপেক্ষী। জগতে এক-একটা লোক দেখা যায়, আকারে-প্রকারে-আচারে-ব্যবহারে-উৎসাহে-আনন্দে-বাক্যে-কার্যে কোনদিনই তাঁহাদিগকে বৃদ্ধ বলিয়া ভাবিতে পারা যায় না। আবার এক-একজন আছেন, যাঁহারা যৌবনের প্রান্তসীমা পার হইতে না হইতেই চুল পাকাইয়া, দন্ত হারাইয়া, ঠন্‌ঠনের চটি পরিয়া, হাতে থেলো হুঁকা লইয়া, হ্রস্বদৃষ্টি, মন্থরকর্মী হইয়া অকালে দাদামশায় বনিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বাক্যে ও ব্যবহারে সর্বদাই যেন এই ভাব ফুটিয়া উঠে—জগতে যাহা কিছু করিবার ছিল শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন ওপার হইতে ডাক আসিলেই হয় আর কি! কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ!…

আহারে ও বিহারে সংযম

অকালবার্ধক্য আমরা অনেক সময় নিজের দোষে বা আপন ইচ্ছায় আমন্ত্রণ করিয়া আনি। যৌবনের স্বাস্থ্য ও ভোগশক্তি যদিও বংশক্রমিকতা ও বাল্যকালীন্ লালনপালনের উপর অনেকটা নির্ভর করে, তথাপি পরবর্তীকালে নিজের যত্ন ও চেষ্টায় উহার অনেকটা উন্নতি-সাধন সম্ভবপর। আমাদের দেশে একটা নীতিকথা আছে—বেশী খাবি তো কম খা, কম খাবি তো বেশী খা; অর্থাৎ পৃথিবীতে বেশী দিন ধরিয়া যদি খাইতে চাও, তাহা হইলে প্রত্যহ অল্প পরিমাণে খাও, এবং যদি অল্পদিনের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে চাও তাহা হইলে প্রত্যহ বেশী পরিমাণে গোগ্রাসে গিলিতে থাক। আহার সম্বন্ধে এই সারবান নীতিটি যেরূপ প্রযোজ্য, বিহার সম্বন্ধেও তাই।

শরীরের ক্ষতি হইবে—তাহা বুঝিয়াও, অথবা শরীরের অনিষ্ট হইতেছে—তাহা দেখিয়াও যে ব্যক্তি শরীরের উপর অত্যাচার করিতে থাকে, তাহাকে সুস্থশরীরে পৃথিবীতে বাঁচাইয়া রাখা সৃষ্টিকর্তারও বুঝি সাধ্যায়ত্ত নহে। কেহ যদি মনে করেন যে, শরীরটি মধুসূদন দাদার দধিভাণ্ড—যতই খরচ করুন না কেন, তাহা আবার নিমেষে পরিপূর্ণ হইবেই, তবে তাহার চেয়ে বড় ভ্রান্তি আর নাই। তাঁহারা 'যৌবনে করিয়া ব্যয় বয়সে কাঙাল' হন্। যখন অনুশোচনা আসে, তখন আর বিগত দিনগুলি ফিরিয়া আসে না! যৌবন-সাধক গীতার সেই অমূল্য উপদেশটি যেন সর্বদা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখেন—

"যুক্তাহার-বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥"…

যৌবনকাল হইতেই আত্মসংযম শিক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। আত্মসংযম অর্থে আমি এই কথা বুঝাইতে চাহি যে, বাক্যে ও চিন্তায় নিজের ভোগসুখের প্রশ্নকে কখনো একচ্ছত্র অধিপতি হইতে না দেওয়া এবং জগতের সুরগ্রামের সহিত নিজের কণ্ঠ মিলানো। আত্মদমনের অর্থ সমস্ত রিপুগুলিরই অবাধ স্ফুরণ যথাসাধ্য বন্ধ করা, কিন্তু একেবারে বিনষ্ট করা নহে। তাহাদের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করা যে, প্রয়োজন হইলে তাহাদের যে-কোনটিকে ক্ষেত্রবিশেষে নিষ্ক্রিয় রাখিতে পারি সহজভাবে, সাবলীলায় ও সানন্দে। তাহারা আপনার অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার; দেখিতে হইবে—কেহ যেন অযথা স্বাধীনতা না লয়, নিয়মমতো মালগুজারি পাঠায়, আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করিয়া বসে। তাহাদিগকে দমন করিতে গিয়া আপনি নিজেই যেন দমিত না হইয়া পড়েন এবং এই শাসনের ফলে শরীর-মনে যেন একটা দীর্ঘস্থায়ী অস্বস্তি, ক্ষত বা দুর্বলতার সৃষ্টি না হয়।

ব্রহ্মচর্য ও বীর্যধারণ সম্বন্ধে সত্য-নির্ধারণ

ব্রহ্মচর্য ব্যাপারটিকে আজকালকার অনেক যুবকযুবতীই যথোপযুক্ত মূল্য দেন্ না। কেহ দেন—কাণা কড়ি, কেহ দিতে চান্ সোনার মোহর। সত্যকার ব্রহ্মচর্য পালন করা অতিশয় কঠিন ব্যাপার,—সাধারণ সাংসারিক লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য। শিশুকাল হইতে যাহাদের সত্তায় কামবেগ ও লৈঙ্গ-সংস্কারের মূলধন অত্যন্ত অল্প, যে পুরুষ কোন বিশেষ কারণে অপর লৈঙ্গধর্মীকে ঘৃণা, সন্দেহ বা ভয় করিতে ও নিজেকে পৃথিবীর পাঁচ জন হইতে পৃথক বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে, তাহার পক্ষে হয় তো কৌপীন্ আঁটিয়া আর্যোবন বীর্যরোধ করা কিছু কষ্টসাধ্য হইলেও অসাধ্য কহে। কিন্তু তৎ-ফলেই সে যে অনন্তযৌবন, অটুট স্বাস্থ্য ও অম্লান রূপের অধিকারী হইবে—এমন কোন কথা নাই। কামে ও প্রেমে অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসী একটা বিরাট বিভেদের উপসাগর সৃষ্টি করিয়াছেন। জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে দুই-চারি ফোঁটা বীর্যপাত হইলেই ভগবানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল, নিজের আত্মা চিরতরে কলুষিত হইল—এই জুজুর ভয়ে কদাচ ভীত হইবেন না। তবে **ইচ্ছাকৃত বীর্যপাতনের স্থান, কাল ও পাত্র সম্বন্ধে সুবিবেচনা ও বিচক্ষণতার প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।**

পঞ্চাশ ফোঁটা রক্ত দিয়া এক ফোঁটা বীর্যের সৃষ্টি হয়—বিশেষ বিশেষ যৌগিক প্রক্রিয়া-দ্বারা বীর্যকে সূক্ষ্ম বা গাঢ়তম করিয়া মেরুদণ্ড-পথে মস্তিষ্কোপরি-চালনা করা যায় এবং তাহাতে অদ্ভুত বিভূতি জন্মে—বীর্য না টলাইয়া যতক্ষণ ইচ্ছা রমণীকে সম্ভোগ করা যায় এবং তদ্দ্বারা স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না—বার্ধক্যেও পুরুষত্বহীনতা ঘটে না···ইত্যাদি বুজরুকি-ভরা কথার

পশরা সাজাইয়া বাংলা ভাষায় অনেক ব্যবসাদারী পুস্তক বাহির হইতেছে এবং সহস্র সহস্র পাঠক উহাদের মোহন ফাঁদে পা দিতেছেন। এই সকল লেখকদের অনেকেই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শারীরসংস্থান ও শারীরক্রিয়াতত্ত্ব সম্বন্ধে ঘোর অজ্ঞ। মুক্কের অন্তঃস্রাবই (Endocrine) আজীবন রক্তস্রোতে মিশিয়া মিশিয়া পুরুষের পুরুষোচিত রূপ-গুণ-বল-বাসনার ফুল ফুটায়,—উহার সহিত শুক্রের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। শম, দম, আহার-নিয়মন, মৈথুনবিরতি দীর্ঘকাল পালন করিলে, ধীরে ধীরে অণ্ডকোষের বীর্যোৎপাদক সনালী গ্রন্থিগুলি নিষ্ক্রিয়তা বশত একবারে শুকাইয়া যায়, মূত্রাশয়ের গাত্র-সংলগ্ন বীর্যস্থলী দুইটিও যায় সংকুচিত নীরস কঠিন হইয়া। কাজে-কাজেই মৈথুন কালে বা গভীর কামাবেগের ফলে যদি-বা ইন্দ্রিয় উত্থিত হয়, তথাপি বহুক্ষেত্রে বীর্যক্ষরণ সম্ভবপর হয় না।···ব্রহ্মচারীর সুষুম্নারজ্জু ধরিয়া জীব বিশেষের বৃক্ষারোহণের ন্যায় বীর্যধারা মস্তিষ্কে উঠিয়া দানা বাঁধে ও ব্রহ্মলোকের সন্ধান দেয়—এই কথা এই যুক্তিবাদের যুগে উন্মাদাগারের প্রাচীর-অন্তরালে নির্বাসিত হওয়ার যোগ্য।

বীর্যপাত না করিয়া যদৃচ্ছা রমণ-ব্যাপারটা যেন মুখমণ্ডল সৃষ্টি না করিয়া একটি বিরাট ভাস্কর্য-মূর্তির প্রতিষ্ঠা—যেন একটা উপসংহারহীন মহানাটকের অভিনয়। ইহার পরিকল্পনাও একটা নির্বীর্যতা, কদর্যতা ও জ্ঞানান্ধতার পরিচায়ক। বীর্যনিঃসারণ-কালই চরমানন্দের দ্যোতক ; রমণের উহাই হইল পরম উদ্দেশ্য—সুরম্য সোপান। পরিণতিহীন সম্ভোগের একটানা প্রচেষ্টায় ও ঐকান্তিকতাহীন উপচার প্রয়োগে উভয় পক্ষই অসার তৃপ্তির সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া, খিন্ন অবসাদের রাজ্যে প্রবেশ করে। তদুপরি, এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত প্রয়াসসাধ্য ; ইহাতে শরীর ও মনের যথাতিরিক্ত ব্যয়াম ও ক্ষয় হয়। পরিশেষে শূলরোগ, কোষ্ঠকাঠিন্য, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, হৃদ্দৌর্বল্য বা nervous debility, শ্বাসকষ্ট বা

হাঁপানি, পুরুষত্বহীনতা প্রভৃতি স্থায়ী ব্যাধি প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব নহে। আমেরিকা ও বিলাতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে Carezza method বলিয়া ঠিক এইরূপ একটা প্রক্রিয়া উদ্ভূত হইয়া, একদল নব্যভাববাদী লোকের দ্বারা আচরিত হইয়াছিল। মজার ব্যাপার এই যে, কতকগুলি রমণাতৃপ্তা নারীই ইহার ঘোরতর সমর্থক ছিলেন। ইহার পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে "অনিডা কলোনি" নামে বিন্দু-সাধনের এক ভক্তমণ্ডলী গঠিত হয়। ইহাদের নিয়ম ছিল, বৃদ্ধবয়স্ক সাধক যুবতীর সহিত, যুবা সাধক বৃদ্ধার সহিত রমণ করিতে পারিবে; কিন্তু একটা নির্দিষ্ট কাল অভ্যাসযোগের পর কোন পুরুষই বীর্যপাত করিতে কিংবা গর্ভোৎপাদন করিতে পারিবে না।...কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সংগোপনে পুনঃ পুনঃ আইনভঙ্গের ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ওই অভিনব সংস্কারপন্থী সাধকসম্প্রদায় বিগলিত হইয়া যায়।

কোথায় তিষ্ঠ—কোথায় তিক্ত ?

আসল কথা, একদিকে যেমন কোন রিপুকেই টুঁটি টিপিয়া মারা চলে না, অন্যদিকে তেমনি কাম বলুন, ক্রোধ বলুন, লোভ বলুন—কোনটিরই অতিরিক্ত ব্যবহার বা অপব্যবহার করা চলিবে না। রিপুগুলি বিষৌষধির মতো। উহাদের প্রত্যেকটি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে এক-একটা শক্ত রোগে অমৃতের কাজ করে, আবার মাত্রাধিক্য ঘটিলে সুস্থলোকের জীবনহানি ঘটায়।...পাঁচটি ভালো লোকের সংসর্গ করিয়া বা পাঁচখানি ভালো গ্রন্থ পড়িয়া, রিপু কোন্ ক্ষেত্রে কতখানি দমন করিতে—কতখানি প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা শিক্ষা করা উচিত। কামের ব্যবহারে যেখানে নিজের বা অপরের ক্ষতি অথবা দারুণ অভিযোগের কারণ ঘটিতে পারে, যেখানে নিজের বা স্বপরিবারের কাহারো শরীরে ব্যাধি-সঞ্চারের সম্ভাবনা—মনে চিরানুতাপ-উদ্রেকের আশঙ্কা, সেখানে তাহার উদ্যত আবেগকে সদর্পে বলিতে হইবে 'তিষ্ঠ'!

যাহার সহিত প্রেম দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না, যাহার প্রেমের পথে সহস্র সংকোচ-সংকটের কণ্টকারণ বিস্তৃত, যাহার প্রেমের পুরোভাগে সমস্ত স্থান জুড়িয়া থাকে দেহ-লালসার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, যাহার প্রেমে শুধু বস্তুগত নেওয়া-দেওয়ারই আতিশয্য, যাহার প্রেম বহু কামুক বা কামুকীর স্পর্শমলিন, যাহাতে না আছে নিত্য নূতনত্ব—না আছে স্বার্থ-ত্যাগের অনুরণনা—না আছে সমবেদনা—না আছে ভাবের গভীরতা, তাহার প্রেম আস্বাদনের পূর্বেই বুঝিবেন 'তিক্ত'!

যৌবশক্তির আর দুইটি ঘোরশত্রু—পানদোষ আর রতিজ ব্যাধি (Veneral disease) অর্থাৎ সিফিলিস, গনোরিয়া প্রভৃতি।...বহুদিনের অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের ফলে বলিতে পারি যে, মদ্যপান আমাদের পক্ষে আদৌ উপযোগী নহে। অথচ কলিকাতার যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রতি ইহার প্রচলন দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। ভবিষ্যতের ভাবনালেশহীন মেস্-প্রবাসী বা ক্ষুদ্র ফ্ল্যাটনিবাসী তরুণ সাহিত্যিকের প্রতিভা-বিকাশের ইহাই অন্যতম অপরিহার্য সুধারূপে পূজিত হইতেছে। তরুণবয়স্ক ছাত্রদের মধ্যেও ইহার প্রচলন ক্রমশ বাড়িয়া চলিতেছে। উহার সামান্য মাত্রা আমাদের শরীরে একটা সাময়িক উত্তেজনা, নিশ্চিন্ত স্ফূর্তি ও সরমহীন প্রগল্‌ভতা আনিতে পারে, কিন্তু অধিক মাত্রায় বিষের কাজ করে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মাত্রামতো পানেরও কোন প্রয়োজন নাই এবং মাত্রা ঠিক রাখিয়া চলাও সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। ফলে লিবার, হৃদয়, মস্তিষ্ক, বৃক্ক (Kidneys) ক্রমশ নষ্ট হইতে থাকে। ইহার ঘোরতর কুফল অনেক সময় শেষ বয়সে দেখা যায়। সুতরাং বৈদ্যের পরামর্শ ব্যতীত সুরাপান সর্বথা পরিত্যাজ্য।

সিফিলিস, গনোরিয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছু 'বিয়ের আগে ও পরে' নামক বইয়ে বলিয়াছি। কে না জানে—

আধুনিক হৃদয়হীন ব্যবসাদারী সভ্যতার মজ্জায় মজ্জায় এই দুইটি ব্যাধি-বিষ প্রবেশ করিয়া আমাদের জীবনী-শক্তি তিলে তিলে শোষণ করিতেছে—জাতির মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিতেছে। কত শত ভদ্র পরিবারের মধ্যে যে ইহাদের প্রভাব দাবানলের মত বাড়িয়া চলিয়াছে,—কত কুমারী, বিবাহিতা নারী, বিধবা যে তাহাদের পশুপ্রকৃতি পিতা, স্বামি বা প্রেমিকদের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে ব্যাধি-সংক্রামিত হইয়া, সারাজীবন লোকচক্ষুর অন্তরালে ব্যথাবিগলিত অশ্রুধারা বিসর্জন করিতেছে,—তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় আমরা বহু পাইয়াছি এবং এখনো নিত্য পাই। সিফিলিস-বিষ পিতামাতা হইতে শুধু সন্তানে নহে, পরবর্তী তিন-চারি পুরুষ পর্যন্ত সঞ্চালিত হইতে পারে। অথচ এই দুইটি ব্যাধিই নিবার্য ও অল্পব্যয়ে উপশমযোগ্য।

যৌবনের উদ্দাম বন্যাস্রোতে পড়িয়া অনেকে হয়ত ইহাদের বহুমুখী কুফলগুলির তীক্ষ্ণতা ততটা উপলব্ধি করেন না, চিকিৎসা বিষয়েও হয়তো সম্যক যত্ন লইতে অবহেলা করেন; সাময়িকভাবে রোগ চাপা দিয়া রাখেন। কিন্তু প্রৌঢ়কালে যখন রক্তস্রোতের প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য স্তিমিত হইয়া আসে, তখন এই রোগ দুইটির দুর্নিবার দানবীয় প্রভাব সুপ্রকট হইয়া পড়ে। এই দুইটি দুরন্ত কালব্যাধি হইতে অকালবার্ধক্য, দুশ্চিন্তাপ্রবণতা, অপস্মার, অন্ধ্যতা, স্মৃতিবিভ্রংশ, কটিবাত, গেঁটেবাত, মৃতবৎসা রোগ, জন্মবন্ধ্যতা (Sterility), পক্ষাঘাত, উন্মাদরোগ আসিতে পারে;—আরো কত শত মারাত্মক রোগ, ক্লেশকর উপসর্গের সৃষ্টি হয়। স্থবির উপযুক্ত অ্যালোপাথিক চিকিৎসায় এই দুইটি রোগই অল্পকাল-মধ্যে নিঃশেষে বিদূরিত হইতে পারে। গনোরিয়া অসম্পূর্ণ চিকিৎসার পর দুই-চারি বৎসর হয়তো সুষুপ্ত থাকিয়া হঠাৎ রুদ্র মূর্তিতে পুনরাবির্ভূত হইতে পারে। আজকাল গনোরিয়ার চিকিৎসা অত্যন্ত সহজসাধ্য হইয়াছে।…যতগুলি ইঞ্জেকশন লইলে সিফিলিস্ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়, ততগুলি কেহ কেহ লইতে অবহেলা করে; কাহারো কাহারো পক্ষে নানা কারণে সম্ভবপর হয় না। মহিলাদের পক্ষে

তো চূড়ান্ত গাফিলতি ও উপেক্ষা করা হয়। মনে থাকে যেন—দুই-এক শিশি পেটেন্ট ঔষধ খাইয়া প্রাথমিক কষ্টকর উপসর্গগুলির উপশম হইলেও রোগজীবাণু ভিতরে সুপ্ত, প্রচ্ছন্ন থাকে। ফাঁক পাইলেই তাহারা পুনরায় সতেজ হয়।

সত্যকার যৌবনসাধককে এই ব্যাধি দুইটির সংস্পর্শ ও সম্ভাবনা হইতে চিরনির্মুক্ত থাকিতে হইবে। তীব্র অনুশোচনার তপ্ত অশ্রুজলে কখনো ইহাদের জলন্ত অভিশাপ—স্মৃতির সম্পীড়ন ঘুচানো যায় না।

দাম্পত্য প্রেমে অরুচি ও একঘেয়েমি

দাম্পত্যজীবনে কাহারো কাহারো কিছুকাল পরে একটা বিতৃষ্ণা বা নির্বেদভাবে আসে; ভোগের নব নব পন্থার প্রতি আকর্ষণ তখন হয়তো ইহাদের মনকে নিভৃতে বিচঞ্চল করিয়া তুলে। যৌবনের জলস্রোতে ভাঁটা পড়িলে তখন পরস্পরের চোখের উপর পরস্পরের ক্রটির বালুচরগুলি বড় হইয়া জাগিয়া উঠে; স্বচ্ছ অগভীর প্রেমতটিনীর তটে তটে একটা নূতন তৃষ্ণার অভিযোগ রণরণিয়া উঠে! ইহার কারণ কি? প্রধান কারণ অবশ্য আকর্ষণের উপায়-প্রয়োগে অসামর্থ্য, যৌবনোচিত ঠাট্ ঠমক ও আচার-ব্যবহার বজায় রাখার প্রতি এক পক্ষের বা উভয় পক্ষের অবহেলা।

দেখা যায়,—স্ত্রীর অযথা টানিয়া-বাড়ানো গৃহিনীপনা ও স্বামীর প্রতি অনিচ্ছাকৃত উদাসীনতা—অনেক প্রৌঢ়কে অন্য নারীর প্রতি অনুরাগী করিয়া তুলে। সাধারণ ঘরের বাঙালী বধূ দুই-তিনটি সন্তান জন্মিবার পরই বাড়িতে রঙীন কাপড় বা ধোপদস্ত শাড়ি-সেমিজ-ব্লাউজ পরিতেই লজ্জাবোধ করেন; বৈকালে প্রসাধনের প্রয়োজনীয়তা প্রায়ই অনুভব করেন না। 'ছিঃ, বুড়ো মাগী আমি, ছেলেপুলেরা কি ভাববে? ঝি-চাকর হয়তো মনে-মনে হাস্‌বে'…ইত্যাদি ধারণার বশবর্তী হইয়া স্বামীর সাক্ষাৎ সেবাটুকু পর্যন্ত করিতে তিনি ইতস্তত করেন। ইচ্ছা থাকিলেও একটা মিথ্যা সম্বিতে বা লোকলজ্জা-

ভয়ে তিনি আত্মসংবরণ করিয়া, পুত্রকন্যা লইয়া অকালে একান্ত বুড়ো গিন্নিটি সাজিয়া, দিবানিশি সংসারের কাজে মজিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, চিন্তা, আচরণ, মনোবৃত্তি ও সাজসজ্জা আমাদিগকে অকালে বৃদ্ধ বানাইয়া দেয়।

আবার ওদিকে স্বামীপ্রবরও মনে করেন, বিবাহ ব্যাপার যখন সুপ্রতিষ্ঠিত ও পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তখন আর চিরকাল বিয়ের বরটি সাজিয়া স্ত্রী-মনোরঞ্জনের এত প্রয়াসের প্রয়োজন কি? জিত রাজ্যে আর অস্ত্র-ঝন্‌ঝনায় তো লাভ নাই! তিনি হয়তো কামনোদ্দীপ্তা বাসকসজ্জিতা আসঙ্গপরীপ্সু পত্নীকে শয়নমন্দিরে একাকিনী জাগ্রতা রাখিয়া আপন বিষয়কর্মের ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকেন। বন্ধুদের লইয়া কভু শিকারে যান—দেশভ্রমণে যান; খেলার মাঠে, বাগানবাটীতে যান। নতুবা অর্ধরাত্র পর্যন্ত সবান্ধবে সিনেমা থিয়েটার দেখেন অথবা ক্লাবে বসিয়া চা-সিগারেট্ কিংবা অন্যবিধ পানীয় সহযোগে তাশ-পাশা-বিলিআর্ড খেলেন। কেহ হয়তো খোঁচা খোঁচা দাড়ির বহর লইয়া, মুখে বিড়ি-সিগারেট-পিঁয়াজ-রসুন-মদের সুবাস ছুটাইয়া, ঘর্মাক্ত কলেবরে বিছানায় চিৎপটাং হইয়া শুইয়া পড়িয়াই সুখে নাসিকাগর্জন সুরু করিলেন,—পাশে আর একটা প্রাণী যে তাঁহার আদরের আশায় বুভুক্ষু অধরযুগ মেলিয়া চাহিয়া আছে, সেদিকে খেয়াল করিবার অবসরও থাকে না! টাকা, আফিস আর বড় সাহেব—টেন্ট্ ম্যাচ্, লীগ্ ম্যাচ, রেস্ আর শেয়ার মার্কেট্ তাঁহাদের প্রাণের বারো আনা স্থান জুড়িয়া থাকে; বাকি চারি আনা ভাগ অধিকার করে কাগুজে পলিটিক্স্ আর পর্দার ছায়াময়ী পরকীয়া।

অরুচি সারার উপায়

পতিপত্নীকে আমরণ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহারা পরস্পরের নিকট সুপরিচিত হইয়াও

যেন অপরিচিত, তাঁহাদের প্রেমের তরুণ তপস্যা সমভাবে চিরপ্রবহমাণা, তাঁহারা চিরকালই সেই বিগত দিনের নব বরবন্ধু,—সাধ্য-সাধনা, বাস্তব-কল্পনা, হাস্য-রহস্য ও আবেগ-রসে চিরপরিপ্লুত।

যথাসম্ভব সেই গূঢ়ার্থব্যঞ্জক সলজ্জ দৃষ্টিপাত,—সংসারের সর্ব কর্মেই সেই দুর্জয় প্রাণশক্তির অজস্র প্রতিভাস —সেই পাওয়া ও হারানোর অবিরাম সংশয়-দোলা—সেই যোগ-বিয়োগের ফাঁকে ফাঁকে হাসিঠাট্টা ও সজল চক্ষুর ঝলক —সেই নিশীথশয়নে মৃদু কুশলজিজ্ঞাসা ও প্রচুর আদর-আপ্যায়ন—সেই প্রথম যৌবনের অঙ্গরাগ ও বেশবিন্যাস দিয়া পরস্পরকে মুগ্ধ, আকৃষ্ট, চিররাগরঙীন রাখিতে হইবে।…তনু-মন-রূপ-যৌবন পরস্পর পরস্পরকে দিয়া তবুও মিতব্যয়ী পাচিকার মতো খানিকটা নিজের কাছে লুকাইয়া রাখিতে হয়। আত্মনমর্পণ করিবেন, কিন্তু আত্মনিবেদন করিবেন না। হৃদয়ের সকল প্রকোষ্ঠের দ্বারা খুলিয়া দিয়া, অন্তত একটি বদ্ধ প্রকোষ্ঠের চাবি নিজের কাছে রাখিয়া দিবেন।

এ যেন আমরণ একটা অবিচ্ছিন্ন রোমান্সের মাদকতাপূর্ণ অবহাওয়া; এ যেন একটা বিরামহীন আলোছায়া-ভরা অখণ্ড জীবনের জগৎ-জোড়া চালচিত্র। কালের কঠিন হিসাব ইহাতে আঁচড় কাটিতে পারে না, শত কর্তব্যের বোঝা—শত দুঃখের ঝঞ্ঝা ইহার স্বপ্নরঙীন মায়াজাল মোচন করিতে অপারগ।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর', 'বিষবৃক্ষ' পড়িয়াছেন তো? অথবা শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ'? সুন্দরী ও শ্রীনাথ, কমলমণি ও শ্রীশ, মৃণাল ও ভবানী ঘোষাল যেন আপনাদের আদর্শ হয়। ইহার উপর আধুনিক কালচারের একটু বার্নিশ—যুগধর্মের একটু পালিশ মাখাইয়া লইবেন, আপত্তি নাই।

আগে মানুষকে নহে, ভালবাসাকে ভালবাসিতে শিখুন। দরকার হইলে নিজের ত্রুটির সহিত প্রেমাস্পদের ত্রুটিকে বরদাস্ত ও প্রেয় করিতে শিখুন।…মনে রাখিবেন, মনের যৌবন দেহের যৌবন অপেক্ষা অনেক বড়, দীর্ঘস্থায়ী।

আনন্দ ও সুখের সুধা

তারপরের কথা—আনন্দ। ভগবান সৎ-চিৎ-আনন্দময়—অত বড় কথা না হয় দৃষ্টান্তের বাহিরে রাখিলাম। কিন্তু বাস্তব জীবনে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, যে যত দুশ্চিন্তাপ্রবণ, 'গোমড়া-মুখো', জিলাপীর প্যাঁচ, সে তত অসুস্থ, অসুখী, স্বল্পায়ু। প্রাণখোলা হাসি স্বাস্থ্য ও পরমায়ু বৃদ্ধি করে। ইহার ন্যায় শক্তিপ্রদ টনিক্ আর নাই। কাজকে বোঝার সামিল করিতে—দুঃখকে অপরাজেয় বলিয়া গসিতে শিখিলেই সর্বনাশ। অফিস ও সংসারের দায়িত্বকে খেলার মতো—জীবনের প্রত্যাসন্ন ও অপ্রত্যাশিত বিপদকে মেধাবী ছাত্রের পরীক্ষার মতো দেখিবেন। ভুবনের সর্ব দ্বন্দ্ব, সর্ব দ্বন্দ্ব, সর্ব পরিস্থিতির মধ্য হইতে আনন্দরস নিঙড়াইয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবেন। সুস্থ, সদাহাস্যময়, প্রসন্ন, সরলপ্রাণ লোকের সহিত সাধ্যমতো মেলামেশা করা উচিত; কারণ ব্যাধির ন্যায় স্বাস্থ্য ও সুখও রীতিমতো সংক্রামক।

হাসি পাইলে হাসি চাপিবেন না। সর্বপ্রথম হাসির রেখা দিয়াই অতিথি-অভ্যাগত সৎকারের চেষ্টা করিবেন। ছেলেমেয়েদের খেলায় যোগ দিবেন, তাহাদের আনন্দের ভাগ লইবেন, বয়োবৃদ্ধ লোকদের পরলোকতত্ত্ব ও ভাবগম্ভীর নৈরাশ্যকর উপদেশের বেড়াজাল যথাসাধ্য এড়াইয়া চলিবেন।...

একবার একটা লোক ফাঁসিমঞ্চে উঠিবার সময় হাসিয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। সকলে মনে করিল সে বুঝি পাগল হইয়া গিয়াছে, নতুবা ভাগ করিয়া চরমদণ্ডদানে বিলম্ব ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে। তারপর সে হাসিতে হাসিতে নিজেই ফাঁসির দড়ি গলায় পরিয়া, কারাধ্যক্ষের নিকট এত স্ফূর্তির কারণ বিবৃত করিল—'Excuse me, I can't stop

laughing. It's splendid ? They're hanging the wrong man ! I never did it.'—রসবোধের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত নয় কি ?

বাল্যকাল হইতে সারা জীবন একটা-কিছু সখ পুষিবেন। তাশ, পাশা, দাবা, সতরঞ্চ খেলা, মাছ ধরা, ম্যাচ দেখা, সিনেমায় যাওয়া মামুলি ধরণের সখ। গান, বাজনা, ছবি আঁকা, ফটো তোলা, দেশ-বিদেশের পোষ্টেজ্ স্ট্যাম্প্ সংগ্রহ করা, কাপড়ে ফুল তোলা, পুতুল গড়া, কবিতা লেখা, কাব্যালোচনা, ফুল-ফলের বাগান তৈয়ারি, মাঝে মাঝে রন্ধন ও নূতন মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা, সবান্ধবে শিকার, জলবিহার, দেশভ্রমণ প্রভৃতি আর একটু উঁচু ধরণের সখ। সুরাপানের 'অষ্টপ্রহর', বাইজী, পরিবারের সান্নিধ্যবর্জিত বাগান-বাড়ির সখ, ঘোড়দৌড়ে বাজি রাখার সখ, ফাট্‌কার সখ, পরের সঙ্গে মিথ্যা ফৌজদারী বাধাইবার সখ—বড় লোকের বিকৃতমনের বদ্‌খেয়াল মাত্র; এগুলিকে ঠিক সখ বলা চলে না। কোন সখে কিছু পয়সা খরচ হয়, কোন সখে কিছু পয়সা রোজগার হয়। কিন্তু সেটা গৌণ; মুখ্য উদ্দেশ্য হইল—সব-ভোলানো আনন্দের কোলে কিছুদিন বা কিছুক্ষণ নিশ্চিন্তে বিরামলাভ।

যাহার জীবনে কোন সখ নাই, তাহার নিজেকে ও অন্য মানুষকে ভালবাসিবার কোন শক্তি নাই; তাহার সত্যকার কোন সখও নাই, জীবনে কোন সুখও নাই।

বৃহৎ পরিবার দুঃখের পারাবার

অতিরিক্ত সন্তানাদির জন্ম প্রত্যক্ষভাবে স্ত্রীলোকের, অসাক্ষাৎভাবে পুরুষের, যৌবন ও সুখশান্তি নষ্ট করে। এজন্য প্রয়োজনের অনুপাতে (দুইটীর কম, চারিটির বেশী নহে) সন্তান পৃথিবীতে আনিয়া, গর্ভসংরোধ করা

ভালো*। দুই, আড়াই, তিন বৎসর অন্তর পর পর তিন-চারিটি সন্তান গর্ভে ধারণ করিলে সুস্থকায় রমণীর যৌবন যাইবার ভয় নাই। বরং কাকবন্ধ্যা ও জন্মবন্ধ্যাদের যৌবনের শেষে নানারূপ ব্যাধি ও বাতিক আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করে। ইহাদের গুরুদেব-বায়ু, কার্পণ্য-বায়ু, খরমুখরতা ও পরশ্রীকাতরতা সব চেয়ে বেশী ও অতি সহজে জন্মিতে দেখা যায়। গর্ভপাত-প্রচেষ্টা বহু ক্ষেত্রে জীবন সংশয়াপন্ন করিয়া তুলে, পুনঃপুন গর্ভনাশ নারীকে চিরকালের জন্য অকর্মণ্য অথর্ব করিয়া ছাড়ে। সুতরাং সাবধান!—

ঈশ্বরে ও নিজের উপর বিশ্বাস

ভগবানে বিশ্বাস রাখুন—ভালো কথা; কিন্তু মহারাজা বিক্রমাদিত্যের তাল-বেতালের মতো তিনি আপনার হুকুমের তাঁবেদার—এ চিন্তার লেশমাত্র মনের কোণে যেন ঠাঁই না পায়। তাঁহাকে তাঁহার কাজ করিতে দিন, আপনি নিজের কর্ম করিয়া যান। শুধু অত্যন্ত দুর্বল বোধ করিলে তাঁহার ধ্যান করুন, তাঁহার নিকট শুধু শক্তি ভিক্ষা করুন। বড় জোর এই পর্যন্ত মাঝে মাঝে গাহিতে পারেন—

"তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামি।
তুমি দাও হে দুঃখ, দাও হে তাপ,
সকলি সহিব আমি!"

* যাঁহারা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ভাবগত ও বস্তুগত যাবতীয় সংবাদ জানিতে চাহেন, তাঁহারা গ্রন্থকারের "জন্ম-শাসন" অনুগ্রহপূর্বক পাঠ করুন।

কিন্তু সে সহনের মধ্যে যেন খুঁৎখুতানি, অসন্তোষ, অসহিষ্ণুতা, অবিশ্বাসের ছোঁয়াচ্ না লাগে। ইহলোকে অখণ্ড সৌভাগ্য অথবা পরলোকে অনন্ত সুখভোগের কামনায় ঈশ্বরের নিকট কখনো প্রার্থনা করিবেন না, ঘুষ ও ভেট্ দিবেন না। তাহা হইলে আপন অন্তর্নিহিত শক্তির উপর—সম্ভাবনীয়তার উপর—এমন কি জন্মজন্মান্তরীন্ কর্মফলের উপর পর্যন্ত প্রত্যয় কমিয়া যাইবে; তিনবার গায়ত্রী জপ করিয়া ত্রিলোক জয় করিবার দুরন্ত স্পৃহা আপনার অন্তরে জাগিবে।...

হ্যাঁ, আর এক কথা। কোন একজনকে গুরু করিয়া, তাঁহাকে অবতাররূপে মাথায় তুলিয়া নাচিবেন না। গুরু অনেক সময় ভগবানের আসনে চড়িয়া বসেন; এমন সব কথা বলেন বা এমন সব কার্য করিতে বলেন—যাহা অনেক সময় আপনার ব্যক্তিগত রুচি, নীতিজ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তার কণ্ঠরোধ করিয়া ফেলে! শেষে তাঁহার ন্যূনতাগুলিকেও পূজা করিবার ও জগদ্বরেণ্য অন্যান্য মনীষীদিগকে ছোট করিবার অন্ধ মোহ আপনাকে পাইয়া বসিবে। আবার গুরুতুষ্টির ব্যয়ও অনেক গৃহস্থ ভক্তের পক্ষে দুর্বহ। তদপেক্ষা জগতের প্রত্যেক মহৎ ব্যক্তির চরিত্রের এক-একটা দিক্‌কে নিজের আদর্শ করিয়া লইবেন এবং তাঁহাদের জীবন-যৌবনের দুঃসাধ্য সধনা ও কৃতিত্বকাহিনী সশ্রদ্ধায় পাঠ করিবেন।

প্রত্যহ নির্জনে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টি হইয়া, সুখাসনে বসিয়া, দীর্ঘশ্বাস লইতে লইতে একমনে কয়েকবার ধীরে ধীরে এই মন্ত্রটি জপ করিবেন—

'আমি বলের অনন্ত আধার, বীর্যের অতল সমুদ্র। আমি কর্মী, আমি বীর, আমি আশাবাদী, আমি প্রেমিক, আমি আনন্দের পূজারী। আমি বিশ্বপ্রকৃতির নিকট হইতে সঞ্জীবতা পাই, সূর্যের নিকট হইতে তেজ পাই, চন্দ্রের নিকট হইতে রূপ পাই। আমি সৌন্দর্য ও যৌবনের চির-অধিকারী।...বার্ধক্য দূর হও, জড়তা দূর

হও, অস্বাস্থ্য দূর হও, ঈর্ষা দূর হও, অসন্তোষ দূর হও। ভগবান, আমি যেন তোমার যোগ্য সন্তান হইতে পারি।'...

* * * *

দেরাদুনে বেড়াইতে গিয়া মুসৌরীর পথে কোন এক ধনী মহিলা এক অপরূপ রূপলাবণ্যবতী প্রৌঢ়া পরিব্রাজিকার সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আশ্চর্য, কি কোরে এই বয়সে আপনি এমন সুন্দর রূপ বজায় রেখেছেন? আপনি কোন দুষ্প্রাপ্য ওষুধ ব্যবহার করেন নাকি?"

গৈরিকবসনা নারী সহাস্যে উত্তর দিয়াছিলেন, "করি বৈকি! আমি ওষ্ঠের জন্যে ব্যবহার করি—সত্য; নাসিকার জন্যে—নির্মল বায়ু ও নাসাপান; কণ্ঠের জন্যে—মিষ্ট বাক্য ও নামগান; চক্ষুর জন্যে—করুণা-দৃষ্টি ও তরুলতার শ্যামলিমা; হস্তের জন্যে—সমভাবে অর্জন ও দান; দেহের জন্যে—টাট্‌কা ফলমূল ও ভৌমস্নান (মাটি-ছাই মেখে অবগাহন-স্নান); গণ্ডের জন্যে—শিশুর চুম্বন; পদদ্বয়ের জন্য—শয়তানের শোণিমা; আর বক্ষের জন্য—স্বার্থহারা প্রেম!...

নব্য বাঙ্‌লার অটুট্ দীর্ঘ যৌবনের সাধক-সাধিকা! তোমাদের মধ্যে কয়জন এই ব্যবস্থাপত্র তোমাদের জীবনের জপমালা করিতে পার?

=বিদায়-নমস্কার=

আঠারো বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়েদের কাছে এই বই বিক্রয় করা হবে না।
নিজে কিনিবেন, নিজে পড়বেন; তারপর ও কজন বিশ্বাসভাজন বন্ধুকে পড়তে দেবেন।

নিখিল প্রেমিকের চিরন্তন প্র[illegible] কি ?

কোন্ যাদুমন্ত্র-বলে যৌবন-জোয়ার আসে, [illegible]ন কেন যায় ?
যৌবন-লক্ষণ কি—ধর্ম্ম কি, কর্ম কি, লক্ষ্য [illegible] কোথায় ?
তার সংজ্ঞা ও স্বরূপ কি, সাধনার কি কি র[illegible] ?
যৌবনের ভ্রষ্ট লগ্নে জাগে কেন বার্ধক্যের ভী[illegible]
যৌবন অটুট থাকে কি উপায়ে—কি কি প্র[illegible]
আমি যারে ভালবাসি সে আমারে কেন না[illegible]

* *

কাল ও পাত্র বিশেষে ভোগ-শক্তির তার[illegible] ঘটে ?
কি ক'রে তাকে বাড়ানো—শেষ পর্য্যন্ত [illegible]াখা যায় ?
মেয়ে ও পুরুষ কোন্ প্রেমিক প্রেমিকা বেশী পছন্দ করে ?
পুরানো একঘেয়ে প্রেম কি ক'রে [illegible]চত্র্যময় হয় ?
রতি-লীলায় কি ভাবে নিবিড়তম সুখ পাওয়া যায় ?
রূপ, স্বাস্থ্য ও পরমায়ু বৃদ্ধি করা কি মানুষের সাধ্য ?

[illegible] শত শত প্রশ্নের সুন্দ[illegible] ও সুসাধ্য মীমাংসা এই বইখানিতে দেওয়া হয়ে[illegible] ছাড়া ব্রহ্মচর্যের [illegible]ম ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য[illegible]ধনার বহু ফলপ্রদ মুষ্টি[illegible] শক্তিবৃদ্ধির বহু সুপ[illegible]ষধ, বিভিন্ন জাতীয় প্রেমি[illegible] মনোবিশ্লেষণ, স[illegible]ম্বন্ধে বহু আ[illegible]র বুজ্‌রুকি—ভ্রান্ত ধারণার নিরসন ও দাম্পত্য জীব[illegible] বহু চমকপ্রদ কাহিনী এতে সন্নিবিষ্ট।

প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারী প'ড়ে খুশী হবেন—উপকার পাবেন।

প্রতি বৎসর একটি ক'রে সংস্করণ বেরুচ্ছে

এটিই হ'ল বইখানির সব চেয়ে সহজ, সংক্ষিপ্ত অথচ জোরালো পরিচয়।—অনেকগুলি ছবি আছে।

এই দুর্মূল্যতার বাজারে সমস্ত মালমসলা সাড়ে-ষোলো আনা বজায় রেখে সেই পুরাণো দাম—

দুই টাকা মাত্র